সন্তু-কাকাবাবু সিরিজ

আগুন-পাখির রহস্য

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
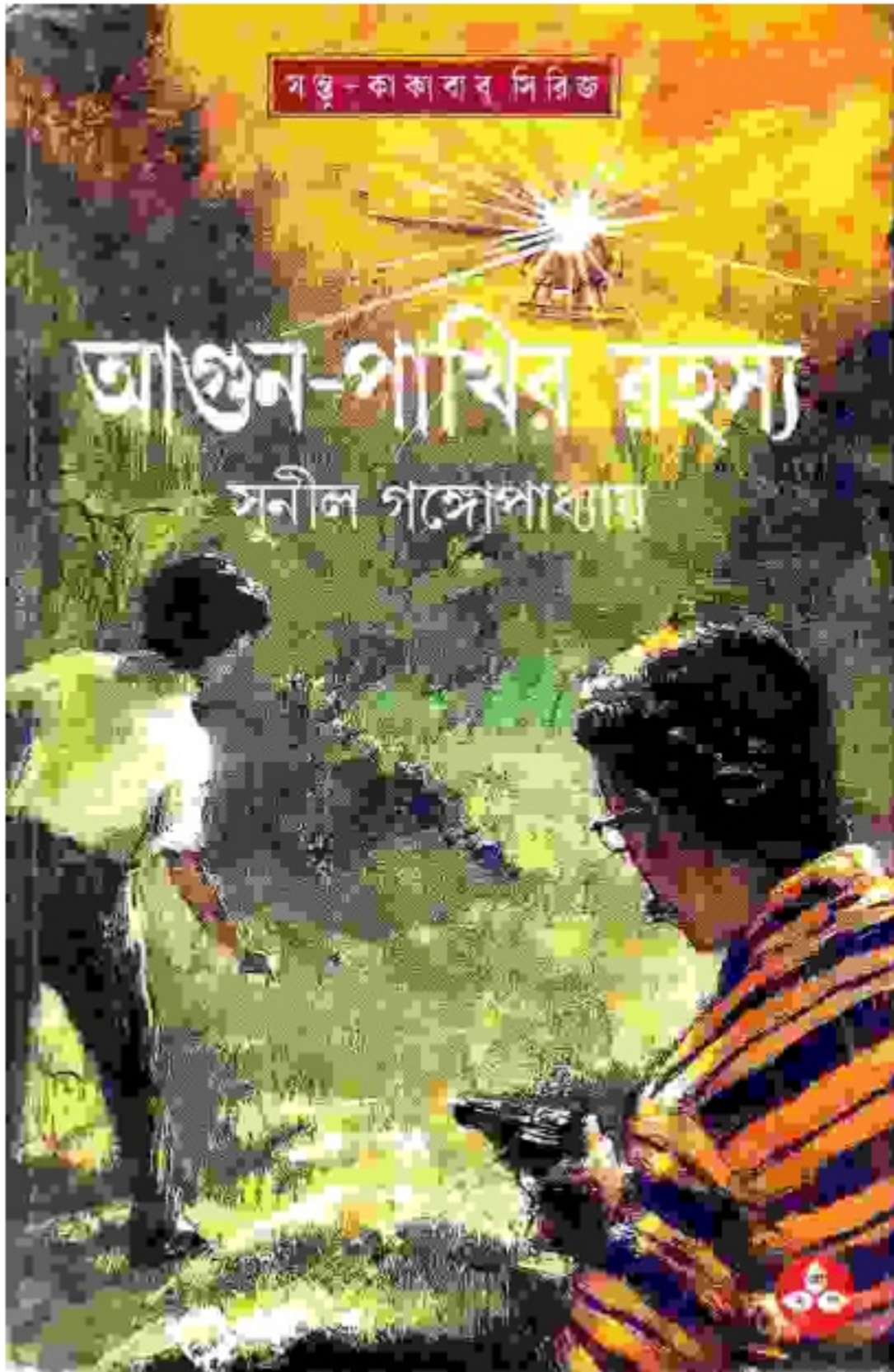
সকালবেলা রেডিয়ো খোলা থাকে, কাকাবাবু দু-তিনখানা খবরের কাগজ পড়েন। কাগজ পড়তে-পড়তে কখনও রেডিয়োতে ভাল গান হলে শোনেন কিছুক্ষণ, আবার কাগজ-পড়ায় মন দেন। বেলা ন'টার আগে তিনি বাইরের কোনও লোকের সঙ্গে দেখা করেন না। কাকাবাবুর মতে, সকালবেলা প্রত্যেক মানুষেরই দু-এক ঘণ্টা আপনমনে সময় কাটানো উচিত। জেগে ওঠার পরেই কাজের কথা শুরু করা ঠিক নয়।

কাকাবাবু ওঠেন বেশ ভোরেই। হাত-মুখ ধুয়ে ময়দানে বেড়াতে যান। সেখানে তিনি বোবা সেজে থাকেন, চেনা মানুষজন দেখলেই চলে যান অন্যদিকে। লোকদের সঙ্গে অপ্রয়োজনে এলেবেলে কথা বলার বদলে গুন্‌গুনিয়ে গান করা অনেক ভাল।

বাড়ি ফিরে কয়েক কাপ চা-পান ও খবরের কাগজ পড়া। রেডিয়োতে লোকসঙ্গীত আর রবীন্দ্রসঙ্গীত হলে কাগজ সরিয়ে রাখেন। আর বাংলা খবরটাও শুনে নেন কিছুটা।

বাংলা কাগজের তিনের পাতায় একটা ছোট খবর বেরিয়েছে, রেডিয়োতে ঠিক সেই খবরটাই শোনাচ্ছে: "উত্তরবঙ্গের

বনবাজিতপুর গ্রামে আবার একটি রহস্যময় বিমান দেখা গেছে বলে গ্রামবাসীরা দাবি করেছে। মাঝরাত্তিরে বিমানটি ভয়ঙ্কর শব্দ করতে-করতে খুব নিচুতে এসে গ্রামের ওপর দিয়ে ঘোরে। গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়...পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে..."

এই সময় রঘু এসে বলল, "কাকাবাবু, আপনার কাছে সেই দু'জন ভদ্রলোক আবার এসেছেন !"

কাকাবাবু টেবিলের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এখনও ন'টা বাজতে পনেরো মিনিট বাকি না ?"

রঘু কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "কী করব, ওনারা যে আরও অনেকক্ষণ আগে এসে বসে আছেন। চা খাবেন কিনা জিজ্ঞেস করলাম, তাও খেতে চাইছেন না, ছটফট করছেন !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই দুই বাবু মানে কোন দুই বাবু ?"

রঘু বলল, "কালকেও যাঁরা এসেছিলেন। একজন বৃদ্ধ ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, আর-একজন মাঝারি কোট-প্যান্ট।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "আবার এসেছে ! জ্বালাতন ! সন্তু কোথায় ?"

রঘু বলল, "খোকাবাবু তো পড়তে বসেছিল, তারপর জোজোবাবু এসে তাকে ম্যাজিক শেখাচ্ছে !"

কাকাবাবু বললেন, "ম্যাজিক একটু পরে শিখলেও চলবে। সন্তুকে গিয়ে বল ওদের সঙ্গে দেখা করতে। সন্তুই যা বলবার বুঝিয়ে দেবে। আমার এখন সময় নেই।"

রঘু চলে যাওয়ার পরেও কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। এখন প্রায় প্রত্যেকদিন তাঁর কাছে নানারকম লোক আসে। কারও বাড়ির গয়না চুরি গেছে, কারও বাড়িতে ভূতের উপদ্রব হচ্ছে,

কোনও বাড়িতে খুন হয়েছে, সেইসব সমস্যা কাকাবাবুকে সমাধান করে দিতে হবে। কেউ-কেউ এজন্য কাকাবাবুকে অনেক টাকাও দিতে চায়।

এসব প্রস্তাব শুনলেই কাকাবাবু রেগে যান। তিনি বলেন, "আমি ডিটেকটিভও নই, ভূতের ওঝাও নই। ওসব কি আমার কাজ ? ওসব তো পুলিশের কাজ।"

তবু লোকেরা শোনে না, ঝুলোঝুলি করে। কাকাবাবু হাতজোড় করে বলেন, "মশাই, আমি খোঁড়া মানুষ, চোর-ডাকাতদের পেছনে ছোটাছুটি করার ক্ষমতা আমার আছে ? আমি বাড়িতে বসে বই-টই পড়ি, শান্তিতে থাকতে চাই। আমায় ক্ষমা করবেন !"

কাকাবাবু আর সন্তুর কয়েকটা অভিযানের কথা অনেকে জেনে গেছে, তাই লোকের ধারণা হয়েছে যে, কাকাবাবু অসাধ্যসাধন করতে পারেন ! কাল এই দুই ভদ্রলোক এসেছিলেন একটা অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার নিয়ে। ওঁদের বাড়ির উনিশ বছরের একটি ছেলে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। তাকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি, সে নিজেই চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। সেই ছেলেকে খুঁজে বের করতে হবে, কাকাবাবুকে ওঁরা প্রথমেই পঁচিশ হাজার টাকা ফি দিতে চেয়েছিলেন। ছেলেকে পাওয়া গেলে আরও পঁচিশ হাজার।

কাকাবাবু বলেছিলেন, "আপনারা পঁচিশ লাখ টাকা দিলেও এ-ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে রাজি নই। একটা কলেজে পড়া উনিশ বছরের ছেলে, তার নিজস্ব ভাল-মন্দ বোঝার জ্ঞান নেই ? সে যদি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে বম্বেতে ফিল্ম স্টার হতে চায় কিংবা হিমালয়ে গিয়ে সাধু হতে চায় কিংবা দেশের কাজে প্রাণ দিতে চায়, তাতে আমি বাধা দেব কেন ?"

তবু নাছোড়বান্দা লোকদুটি আজ আবার এসেছেন !

রেডিয়োর খবরটা পুরোপুরি শোনা হল না। রহস্যময় বিমানটির কথা বাংলা কাগজে ছাপা হয়েছে বটে, কিন্তু রেডিয়োতে পুলিশের বক্তব্য শোনানো হচ্ছিল, সেটা কাগজে নেই। বাংলা কাগজে লিখেছে যে, বিমানটির গা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোচ্ছিল। নিজস্ব সংবাদদাতার ধারণা, সেটা সাধারণ বিমান নয়। মহাকাশযান !

কাকাবাবু অস্ফুট স্বরে বললেন, "ইউ এফ ও !"

রঘু সিঁড়ি দিয়ে তিনতলায় উঠে গেল সন্তুকে ডাকতে। সন্তুকে সে খুব বাচ্চা বয়েস থেকে দেখছে বলে সে এখনও তাকে খোকাবাবু বলে। বন্ধুদের সামনে ওই ডাক শুনলে সন্তু রেগে যায়। শুধু খোকা বললে আপত্তি ছিল না, অনেক বয়স্ক লোকেরও ডাকনাম হয় খোকা, কিন্তু খোকাবাবু শুনলেই মনে হয় না বাচ্চা ছেলে ? গত বছর নেপাল থেকে ফেরার পর রিনি ইয়ার্কি করে বলেছিল, "'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন' হল তা হলে ?"

তিনতলায় একটাই মাত্র ঘর, এই ঘরখানা সন্তুর নিজস্ব। পাশে অনেকখানি খোলা ছাদ। খুব গরমকালে রাত্তিরে সন্তু একটা মাদুর পেতে এই ছাদে শুয়ে থাকে। মেঘের খেলা দেখে, কিংবা নক্ষত্রদের দিকে তাকিয়ে কোটি-কোটি মাইল দূরে তার মন চলে যায়।

এখন ঘরের মধ্যে জোজো তাকে তাস অদৃশ্য করার ম্যাজিক দেখাচ্ছে।

রঘু দরজার কাছে এসে খোকাবাবু বলে ডাকতে গিয়েও চেপে গেল। বলল, "এই যে, একবার নীচে যাও ! কাকাবাবুর সেক্রেটারি হয়েছ যে। কালকের সেই দু'জন ভদ্রলোক এসেছেন, তাদের মিষ্টিমুখে বিদায় করতে হবে !"

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, "লোক বিদায় করতে হবে ? আমি ওই কাজটা দারুণ পারি। তুই মুখ খুলবি না, সন্তু, যা বলার আমি বলব !"

বসবার ঘরে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ম্লান মুখ করে বসে আছেন সোফায়। আর অন্য লোকটি দাঁড়িয়ে আছেন জানলার কাছে, তাঁর মুখে একটা ছটফটে ভাব।

জোজো ঘরে ঢুকে বলল, "নমস্কার। আমি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর ফার্স্ট সেক্রেটারি, আর এ ডেপুটি সেক্রেটারি ! আপনাদের কী দরকার বলুন ?"

মাঝবয়েসী লোকটি বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, মানে, কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না ?"

জোজো বলল, "উনি তো রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন, ব্যস্ত আছেন। তা ছাড়া, আমাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করলে তো ওঁর সঙ্গে দেখা করা যায় না !"

ভদ্রলোক সন্তু আর জোজোর মুখের দিকে তাকিয়ে তারপর জোজোর চোখে চোখ রেখে বললেন, "তুমিই নিশ্চয়ই সন্তু? তোমার কথা অনেক শুনেছি। তুমি ভাই কাকাবাবুকে একটু বুঝিয়ে বলবে? আমরা খুব বিপদে পড়েছি।"

সন্তু বাড়িতে হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে থাকে, জোজোর তুলনায় তাকে ছোট দেখায়। তা ছাড়া এমনিতেও সে শান্তশিষ্ট আর লাজুক ধরনের। জোজোর চেহারা সুন্দর, সে পরে আছে ফুল প্যান্ট, ফুল শার্ট, মাথার চুল ওলটানো আর কথা বলে চোখে-মুখে। সন্তু যে কতটা সাহসী আর জোজো যে কতটা ভিতু, তা ওদের চেহারা দেখে বুঝবার উপায় নেই।

জোজো সন্তু সেজে বলল, "হ্যাঁ, আপনাদের কেসটা কী বলুন!"

ভদ্রলোক বললেন, "ইনি আমার দাদা বীরমোহন দত্ত, আর আমার নাম রামমোহন দত্ত। কলেজ স্ট্রিটে আমাদের কাগজের দোকান। আমার দাদার সাত মেয়ে, একটিও ছেলে নেই। আমার তিন মেয়ের পর একটিমাত্র ছেলে। উনিশ বছর বয়েস, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে। তিনদিন আগে সে তার মায়ের সঙ্গে রাগারাগি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। টাকা-পয়সা নিয়ে যায়নি, কিচ্ছু নিয়ে যায়নি, সে কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, ভেবে-ভেবে আমরা মরে যাচ্ছি। তুমি ভাই কাকাবাবুকে বলো..."

জোজো বলল, "ছেলেটির কী নাম?"

রামমোহন দত্ত বললেন, "তপন, তপনমোহন দত্ত।"

জোজো এবার হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "ছবি? ছবি এনেছেন?"

রামমোহন দত্ত বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ এনেছি। কালার, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট চারখানা ছবি। এই যে..."

সন্তুও উঁকি মেরে ছবিগুলো দেখল। বেশ ভালই দেখতে ছেলেটিকে। রোগা-পাতলা, বড়-বড় চোখ, থুতনিতে একটা আঁচিল। একটা ছবিতে তার হাতে একখানা ক্রিকেট-ব্যাট।

রামমোহন দত্ত বললেন, "তা হলে কি পঁচিশ হাজারের চেকটা..."

জোজো পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে বলল, "সতেরো থেকে পঁচিশ তারিখ নেপাল, তারপর জয়পুরের মহারাজার চব্বিশখানা হিরে, মানস সরোবরের তিনটে চোখওয়ালা অদ্ভুত প্রাণী, প্রেসিডেন্ট অব ইন্ডিয়ার ফাইল চুরি, এর মধ্যে আবার মস্কো যেতে হবে দু'বার, কী করে যে এত ম্যানেজ করবেন... হ্যাঁ, আপনাদের কেসটা মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী নিতে পারেন দু' মাস সতেরো দিন পর।"

রামমোহন দত্ত বললেন, "অ্যাঁ?"

জোজো বলল, "তার আগে উনি সময় দিতে পারবেন না!"

রামমোহন দত্ত বললেন, "অতদিন ছেলেটা নিরুদ্দেশ হয়ে থাকবে? খাবে কী? ওর মা-ও কিছু খাচ্ছেন না এই তিনদিন। তুমি ভাই প্লিজ কাকাবাবুকে বলে ব্যবস্থা করো, যাতে আমাদের কেসটা আগে নেন।"

জোজো ভুরু তুলে বলল, "আপনাদের জন্য কাকাবাবু নেপালের মহারাজা, জয়পুরের মহারাজা, ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্টের কাছে মিথ্যে কথা বলবেন? দু' মাস সতেরো দিন পর্যন্ত আপনারা যদি অপেক্ষা করতে না পারেন..."

বীরমোহন দত্ত এতক্ষণ পর বললেন, "তবে আর এখানে বসে থেকে লাভ কী? রামু, চল, পুলিশের কাছেই যাই।"

এই সময় আরও দু'জন ভদ্রলোক দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "রাজা রায়চৌধুরী আছেন? আমাদের বিশেষ

দরকার।"

জোজো বলল, "আপনাদের কী কেস? খুন? নিরুদ্দেশ? চুরি?"

ওঁদের মধ্যে একজন বললেন, "কাল রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে একটা খুন হয়েছে, সে আমাদের বাড়ির কেউ নয়, ছাদে পড়ে আছে ডেডবডি।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ছেলে, না মেয়ে?"

ভদ্রলোক বললেন, "মেয়ে।"

জোজো বলল, "আপনাদের বাড়ির কেউ নয়, তা হলে ডেডবডি ছাদে কী করে এল?"

ভদ্রলোক বললেন, "সেইটাই তো রহস্য! আমরা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জোজো বলল, "দু' মাস সতেরো দিন...।"

বীরমোহন আর রামমোহন দত্ত চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে এঁদের কথা শুনছিলেন। এই নতুন ভদ্রলোকও রামমোহন দত্তর মতনই বললেন, "অ্যাঁ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আপনাদের বাড়ির ওই রহস্যের সমাধান যদি মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীকে দিয়ে করাতে চান, তা হলে দু' মাস সতেরো দিন অপেক্ষা করতে হবে। তার আগে পর্যন্ত উনি বুক্‌ড। একটুও সময় নেই। এই দত্তবাবুদের জিজ্ঞেস করে দেখুন!"

সবাই চলে যাওয়ার পর দরজা বন্ধ করে দিয়ে জোজো বলল, "ভাবছি আমি নিজেই একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলব।"

সন্তু বলল, "সেটা বোধ হয় তুই ভালই পারবি!"

জোজো বলল, "আমি যদি কাকাবাবু হতাম, তা হলে দত্তদের কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকার অ্যাডভান্সটা নিয়ে নিতাম। ও

ছেলেটা তো দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে বোঝা যাচ্ছে।"

সন্তু বলল, "তুই কোনওদিন কাকাবাবুর মতন হতে পারবি না। সেইজন্য কেউ তোকে আগে থেকেই পঁচিশ হাজার টাকা দিতেও চাইবে না।"

এ-কথাটা গায়ে না মেখে জোজো কথা ঘুরিয়ে বলল, "দশ-দশটা দিদি! ওরে বাপ রে! আমি তপন দত্ত হলে আমিও বাড়ি ছেড়ে পালাতাম।"

সন্তু হেসে বলল, "বেশি দিদি থাকা তো ভালই। ঘুরে-ঘুরে সব দিদিদের বাড়িতে খাওয়া যায়।"

জোজো বলল, "দশটা দিদি মানে দশখানা জামাইবাবু, সেটা ভুলে যাচ্ছিস? সবাই মিলে কত উপদেশ দেবে।"

সিঁড়ি দিয়ে ওরা উঠে এল দোতলায়। কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চলে গেছে তো?"

জোজো বলল, "শুধু ওরা নয়, আরও নতুন ক্লায়েন্ট এসেছিল, কাকাবাবু। তাদেরও বিদায় করে দিয়েছি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি জোজোকে তোমার প্রাইভেট সেক্রেটারি রাখতে পারো। দারুণভাবে ম্যানেজ করল।"

জোজো সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "টেকনিকটা বুঝলি তো? কাউকেই মুখের ওপর না বলতে নেই। কাকাবাবু পারবেন না কিংবা রাজি নন, তাও বলতে হল না।"

কাকাবাবু জোজোর মুখে সব শুনে খুব হাসতে লাগলেন।

ড্রয়ার খুলে দুটো চকোলেট বের করে দু'জনকে দিয়ে বললেন, "জোজো আমাকে এরকমভাবে রোজ বাঁচালে তো ভালই হত। কিন্তু পড়াশুনো ফেলে রোজ সকালে তো আর এখানে এসে বসে থাকতে পারবে না। আমি ভাবছি কয়েক দিনের জন্য কলকাতা ছেড়ে পালাব। সন্তু, তোর এখন পড়াশুনোর চাপ কীরকম?

আমার সঙ্গে কোচবিহার যাবি!”

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, “কোচবিহারের মহারাজা আপনাকে নেমন্তন্ন করেছেন বুঝি?”

কাকাবাবু বললেন, “না হে জোজোবাবু, কোনও মহারাজা-টহারাজার সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আমাকে তাঁরা নেমন্তন্ন করবেনই বা কেন? আমি যাচ্ছি বেড়াতে। সেইসঙ্গে খানিকটা কৌতূহলও মিটিয়ে আসা যাবে। তুমি ইউ এফ ও কাকে বলে জানো?”

জোজো এমনভাবে সন্তুর দিকে তাকাল, যেন এইসব সহজ প্রশ্নের উত্তর সে নিজে দেয় না, তার সহকারীর ওপর ভার দেয়।

সন্তু বলল, “আনআইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।”

কাকাবাবু বললেন, “পৃথিবীর নানা জায়গায় নাকি এগুলো দেখা যায়। কেউ-কেউ বলে, উড়ন্ত চাকি। চৌকো, লম্বা, গোল—অনেক রকমের হয়, আকাশে একটুক্ষণ দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। অনেকের ধারণা ওগুলো পৃথিবীর বাইরে থেকে আসে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটারও ছবি তুলতে পারেনি। ওরকম যে সত্যিই কিছু আসে, তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণও পাওয়া যায়নি। অথচ প্রায়ই শোনা যায়। কোচবিহার জেলার বনবাজিতপুর নামে একটা গ্রামে নাকি সেইরকম একটা ইউ এফ ও দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।”

সন্তু বলল, “এত জায়গা থাকতে হঠাৎ এইরকম একটা গ্রামে কেন ইউ এফ ও আসবে?”

কাকাবাবু বললেন, “সেটাও একটা প্রশ্ন তো বটেই। সে-গ্রামের লোক নাকি দু-তিনবার দেখেছে, সেটার বর্ণনাও দিয়েছে। সে-কথা ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে, রেডিয়োতেও বলেছে। সুতরাং এত কাছাকাছি যখন ব্যাপার, তখন চক্ষু-কর্ণের

বিবাদভঞ্জন করে এলেই তো হয়। তা হলে কিন্তু আজই যেতে হবে, দেরি করার কোনও মানে হয় না। বউদির মত আছে কিনা জিজ্ঞেস কর।”

মা স্নান করতে গেছেন, সন্তু উঠে এল নিজের ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। মা-বাবা আপত্তি করবেন না, তা সন্তু জানে।

জোজো তার সঙ্গে-সঙ্গে এসে নিচু গলায় বলল, “কাকাবাবু কীরকম মানুষ রে, সন্তু? পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে লোকে সাধাসাধি করছে সামান্য একটা কেস সল্‌ভ করার জন্য, সেটা না নিয়ে উনি নিজের পয়সা খরচা করে চললেন উড়ন্ত চাকি দেখতে কোচবিহার?”

সন্তু বলল, “একটু আগেই তো বললাম, তুই জীবনেও কাকাবাবুর মতন হতে পারবি না, তাই এসবের মর্মও বুঝবি না।”

জোজো বলল, “কোচবিহার এমন কিছু বেড়াবার মতন জায়গা নয়। আর উড়ন্ত চাকি-ফাকি দেখবারই বা কী আছে?

সন্তু কোনও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, “সরি সন্তু, এবারে আমি তোদের সঙ্গে যেতে পারছি না। জাপানের সম্রাট বাবাকে নেমন্তন্ন করেছেন, আমাকেও যেতে বলেছেন বিশেষ করে। কালই আমরা জাপান রওনা হচ্ছি। টোকিয়োতে হোটেল বুক করা হয়ে গেছে।”

সন্তু এবার হাসিমুখে তাকাল। জোজোকে সঙ্গে নেওয়ার কথা কাকাবাবু একবারও বলেননি, তাই জোজোর অভিমান হয়েছে।

সন্তু বলল, “তোর পায়ে ধরে সাধলেও যাবি না?”

জোজো বলল, “জাপানের সম্রাটের বোনের বিয়ে। বাবাকে দিয়ে কোষ্ঠী পরীক্ষা করাবেন। আমাদের না গেলে চলবে কী করে?”

সন্তু বলল, "তা অবশ্য ঠিক। জাপানের রাজবাড়ির নেমন্তন্ন ফেলে কি কোচবিহার যাওয়া যায়? ফিরে এসে তোর কাছে জাপানের গল্প শুনব।"

জোজো বলল, "তুই ক্যামেরা নিয়ে যাচ্ছিস তো! যদি উড়ন্ত চাকির ছবি তুলে আনতে পারিস, তা হলে তোকে আমি টোরা-টোরা-ফ্লোরা খাওয়াব।"

সেটা যে কী জিনিস, তা আর জিজ্ঞেস করতে সাহস পেল না সন্তু।

কোচবিহার শহরে প্লেনেও যাওয়া যায়। আগেকার আমলের ডুর্নিয়ের প্লেন, এতই ছোট যে, সতেরো-আঠারো জনের বেশি যাত্রী আঁটে না। প্লেনটার কোথাও ফুটোফাটা আছে কিনা কে জানে, কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকে সন্তুকে একেবারে শীতে কাঁপিয়ে দিল। কাকাবাবুর অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন বাইরে।

এক সময় হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো সন্তু, এই লাইন দুটো কোন্ কবিতায় আছে?

নমো নমো নমো সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি,
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর জীবন জুড়ালে তুমি..."

সন্তু থতমত খেয়ে গেল। লাইন দুটো তার মুখস্থ, রবীন্দ্রনাথের লেখা তাও জানে, রচনা লেখার সময় এই লাইন

দুটো কোটেশান হিসেবেও ব্যবহার করেছে। কিন্তু কোন্ কবিতার লাইন, তা তো মনে পড়ছে না!

কাকাবাবু বললেন, "পারবি না? 'বাবু কহিলেন বুঝেছ উপেন, এ জমি লইব কিনে।' এটা কোন্ কবিতায় আছে?"

সন্তু লজ্জা পেয়ে বলল, "দুই বিঘা জমি।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের এই বাংলা দেশকে নিয়ে কী-কী কবিতা আছে বলতে পারিস?"

সন্তু আকাশপাতাল ভাবতে লাগল। কেউ জিজ্ঞেস করলে মনে পড়ে না। অথচ এরকম অনেক কবিতা পড়েছে সে।

হঠাৎ মুখ-চোখ উজ্জ্বল করে সে বলল, "ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা। তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা..."

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, ডি এল রায়ের এই গানটা আছে বটে, কিন্তু এর মধ্যে বাংলা কিংবা বাংলাদেশ নামটা কোথাও নেই। আমাদের ছেলেবেলায় আর-একটা গান খুব জনপ্রিয় ছিল, বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রি আমার! আমার দেশ, কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!"

কাকাবাবু প্রায় জোরে-জোরে গাইতেই শুরু করে দিলেন গানটা। প্লেনের মধ্যে সবাই চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে, কিংবা পাশের লোকের সঙ্গে ফিসফিসিয়ে কথা বলে। কেউ গান গায় না। অনেক যাত্রী ঘাড় তুলে এদিকে তাকাচ্ছে। সন্তুর অস্বস্তি বোধ হল। কিন্তু কাকাবাবুর কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। খানিকটা গাইবার পর তিনি বললেন, "প্লেন থেকে যতবার নিজের দেশটাকে দেখি, আমার কেমন যেন একটা দুঃখ-দুঃখ ভাব আসে মনের মধ্যে। এমন সুন্দর আমাদের দেশ, অথচ মানুষ কত কষ্টে আছে, কত দারিদ্র্য।"

ককপিটের দরজা খুলে মাথায় টুপি-পরা সুন্দর চেহারার একজন লোক এইদিকে এগিয়ে এল। কাকাবাবুর দিকে দৃষ্টি। সন্তু ভাবল, এই রে, লোকটি নিশ্চয়ই কাকাবাবুর গান গাইবার জন্য আপত্তি জানাতে আসছে!

লোকটি ওদের কাছেই এসে থামল। তারপর নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে খুঁজতে লাগল কী যেন।

কাকাবাবু নিজের ভাবে বিভোর হয়ে ছিলেন, চমকে গিয়ে বললেন, "আরে? কে? ওহো, অরিন্দম, তুমি এই প্লেনের পাইলট বুঝি? থাক, থাক, পায়ে হাত দিতে হবে না।"

অরিন্দম তবু কাকাবাবুর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "অনেকদিন পর আপনাকে দেখলাম, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এ প্লেন তো আর কোচবিহারের পরে যাবে না। কোচবিহারেই যাচ্ছি। তুমি ককপিট ছেড়ে উঠে এলে কী করে?"

অরিন্দম বলল, "কো-পাইলট আছে, ভয় পাবেন না। কোচবিহারে যাচ্ছেন, ওখানকার রাজা নেমন্তন্ন করেছেন বুঝি?"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, "দেখছিস, আমি যে-সে লোক নই। সবাই ভাবে, রাজা-মহারাজারা আমাকে হরদম ডাক পাঠায়।"

তারপর অরিন্দমের দিকে ফিরে বললেন, "না হে, সেসব কিছু না। এমনই যাচ্ছি কোচবিহারে বেড়াতে। তা ছাড়া আমি যতদূর জানি, কোচবিহারের রাজা-রানিরা এখন সবাই থাকেন কলকাতায়। ওখানকার দারুণ সুন্দর রাজবাড়িটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

অরিন্দম বলল, "এই যে একেবারে সামনের সিটে যিনি বসে আছেন, তিনি এখানকার বড় রাজকুমার। আপনার সঙ্গে আলাপ

করিয়ে দেব?"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, কোনও দরকার নেই। আমি নিরিবিলিতে দু-চারটে দিন এদিকে কাটিয়ে যেতে চাই।"

অরিন্দম ফিরে গেল ককপিটে। তার একটু পরেই প্লেনটা নামতে লাগল নীচের দিকে। বেশ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে মাটি স্পর্শ করল।

জিনিসপত্র ফেরত পেতে বেশি সময় লাগল না। অরিন্দম নিজে কাকাবাবুর সুটকেসটা বয়ে নিয়ে যেতে-যেতে বলল, "ইস, আগে জানলে আমি ছুটি নিয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে পারতাম এখানে। আমাকে এই প্লেন নিয়েই ফিরে যেতে হবে একটু বাদে।"

এয়ার স্ট্রিপের বাইরে একটা বাস আর দু-একখানা গাড়ি রয়েছে, আর একঝাঁক পুলিশ।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এত পুলিশ কেন?"

অরিন্দম বলল, "আজ একজন মন্ত্রীর ফেরার কথা আছে শুনেছি। মন্ত্রী থাকলে পুলিশ থাকবেই।"

একটা জিপ গাড়ির বনেটে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন পুলিশ অফিসার। কপালের ওপর একটা হাত রেখে রোদ আড়াল করেছে। হাতখানা সরিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, "মিঃ রায়চৌধুরী?"

কাকাবাবু ঠিক চিনতে পারলেন না। লোকটির দিকে হাত তুলে নমস্কার করলেন।

লোকটি সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "আমায় চিনতে পারছ? সেই যে সেবারে তোমরা বজ্র লামার গুম্ফায় ঢুকে বিপদে পড়েছিলে? আমি তখন ছিলাম দার্জিলিং জেলার এস. পি.। সেই সময় দেখা হয়েছিল, মনে নেই? এখন কোচবিহারে বদলি হয়ে এসেছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, মনে আছে। আপনিই তো অনির্বাণ মণ্ডল।"

অনির্বাণ মণ্ডল বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এসে পড়েছেন, খুব ভাল হয়েছে। এখানে পর-পর দুটো রহস্যময় খুন হয়েছে। খুনি ধরা পড়েনি, কাউকে সন্দেহও করা যাচ্ছে না। আপনার কাছ থেকে নিশ্চয়ই সাহায্য পাওয়া যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, ওসব খুনটুনের মধ্যে আমি নেই। রক্তারক্তির কথা শুনলেই আমার গা গুলোয়। আমি আর সন্তু এখানে বেড়াতে এসেছি। মিঃ মণ্ডল, আপনি সেবারে শেষদিকে আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন, সেজন্য ধন্যবাদ।"

অনির্বাণ মণ্ডল বলল, "আমাকে 'মিঃ মণ্ডল' আর 'আপনি' বলছেন কেন? শুধু অনির্বাণ বলে ডাকবেন। আমি আপনার ভক্ত। কোচবিহারে বেড়াতে এসেছেন, উঠবেন কোথায়?"

"সার্কিট হাউসে।"

"আগে থেকে বুক করা আছে?"

"না, তা নেই। কেন, সেখানে জায়গা পাওয়া যাবে না?"

"অনেক আগে থেকে সব ঘর বুক্‌ড থাকে। আমার সঙ্গে চলুন, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেখানে না হয়, আমার বাংলোতে থাকবেন। তাতে আমি বেশি খুশি হব।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে কাকাবাবু আর সন্তুকে আমি মিঃ মণ্ডলের হাতে সমর্পণ করলাম। আমি এবার চলি।"

ওদের সুটকেস দুটি এস. পি. সাহেবের জিপে তোলা হল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসে আছে একজন বডিগার্ড। সন্তু আর কাকাবাবু বসলেন পেছনে। গাড়ি চলতে শুরু করার পর সন্তু জিজ্ঞেস করল, "বজ্র লামার গুম্ফায় যে ফুটফুটে ছোট্ট ছেলেটি ছিল, ওখানে সবাই বলত তার বয়েস নাকি তিনশো বছর, সেই

ছেলেটি এখন কেমন আছে?"

অনির্বাণ বলল, "সে ভালই আছে। তাকে একবার দিল্লিতে রাষ্ট্রপতির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে শেষ যা খবর পেয়েছি, ওই ছেলেটির যে বিশেষ একটা শক্তি ছিল, মাঝে-মাঝে ওর শরীরে বিদ্যুতের তরঙ্গ বইত, ওকে ছুঁলে ইলেকট্রিক শক খাওয়ার মতন মনে হত, সে-শক্তিটা ওর নষ্ট হয়ে গেছে। আর ও কাউকে ছুঁয়ে দিলে কিছুই হয় না। ও এখন গুম্ফার পাঠশালায় পড়াশুনো করছে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে।"

সন্তু বলল, "সত্যিই কি কেউ তিনশো বছর বাঁচতে পারে?"

অনির্বাণ বলল, "বাইবেলে ম্যাথুসেলা নামে একজনের কথা আছে। সে কিছুতেই মরতে চায়নি, তিনশো বছর আয়ু চেয়েছিল!"

কাকাবাবু বললেন, "মহাভারতেও তো যযাতির কথা আছে। রাজা যযাতি চেয়েছিলেন অনন্ত যৌবন! খুব বেশিদিন বেঁচে থাকাটা মোটেই ভাল না। নতুন-নতুন যেসব ছেলেমেয়ে জন্মাবে, তাদের জন্য এই পৃথিবীতে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে না?"

সার্কিট হাউসে পৌঁছে দেখা গেল সত্যিই কোনও ঘর খালি নেই। শুধু সবচেয়ে ভাল ঘরখানি কোনও মন্ত্রী-টন্ত্রি ধরনের ভি. আই. পি.-র জন্য বন্ধ করা থাকে। অনির্বাণ মণ্ডলের আদেশে সেই ঘরখানাই খুলে দেওয়া হল। খাবারদাবারেরও সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অনির্বাণ বলল, "তা হলে আপনারা এখন বিশ্রাম নিন। এদিকে কোথাও বেড়াতে যাওয়ার প্ল্যান আছে? তা হলে আমি গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "কাছাকাছি কোনও জঙ্গলে ঘুরে আসতে চাই। একটা গাড়ি পেলে তো ভালই হয়!"

অনির্বাণ বলল, "বিকেলেই গাড়ি পাঠাব। চিলাপাতা ফরেস্টের দিকে যদি যান, পথেই পড়বে পায়রাডাঙ্গা নামে একটা জায়গা। সেখানে পরশু রাতেই একটা ডেডবডি পাওয়া গেছে একটা মস্ত বটগাছের ওপরের দিকের ডালে। লোকটি ওই গ্রামের এক দোকানদার। কোনও কারণে রাত্তিরবেলা একা বাইরে বেরিয়েছিল, গাছে উঠে কিন্তু আত্মহত্যা করেনি। সেরকম কোনও চিহ্ন নেই। কিছু একটা জিনিস দেখে সাঙ্ঘাতিক ভয় পেয়েছিল মনে হয়, তাই গাছে উঠে পড়েছিল। কী দেখে সে অত ভয় পেতে পারে? বাঘ বা হাতি বা সাপ যদি হয়, ওসব দেখতে এখানকার মানুষ অভ্যস্ত, গাছে উঠতে আর তেমন ভয় নেই। কিন্তু লোকটা সেখানে বসেও ভয়েই মরে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আবার ওই কথা? খুন, জখম আর অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা শুনতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তোমাদের মতন পুলিশদেরই কাজ এইসব সমস্যার সমাধান করা।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "লোকটি ইউ এফ ও দেখে ভয় পায়নি তো?"

অনির্বাণ মণ্ডল দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। এবার ভেতরে এসে একটা সোফায় বসে পড়ে বলল, "ইউ এফ ও? ওহো, এবার বুঝেছি, সন্তু-কাকাবাবুর হঠাৎ কেন কোচবিহারে আগমন! ইউ এফ ও রহস্য?"

তারপর সে হা-হা করে জোরে হেসে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার ইউ ওফ ও'র খবর কাগজে ছাপা হয়েছে, রেডিয়োতেও বলেছে। এ-ব্যাপারে তোমাদের পুলিশের বক্তব্য কি শুধু অট্টহাসি?"

অনির্বাণ বলল, "না কাকাবাবু, সত্যিকারের ইউ এফ ও দেখা

গেলে তো আমিই ছবি তুলতাম। জানেনই তো, গ্রামের লোক একটা কিছু হুজুগ পেলেই মেতে ওঠে। তিলকে তাল করে। ওটা একটা আর্মির হেলিকপ্টার। আমি নিজে খোঁজখবর নিয়ে জেনেছি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বনবাজিতপুরের মতন একটা নগণ্য গ্রামে আর্মির হেলিকপটার প্রায়ই মাঝরাত্তিরে এসে চক্কর দেয় কেন?"

অনির্বাণ বলল, "ওই হেলিকপটার চালান কর্নেল সমর চৌধুরী। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, বেশ মজার মানুষ। অনেক ব্যাপারে উৎসাহ আছে। টোবি দত্তর বাড়িতে নীল আলোটা কেন জ্বলে সেটা উনি দেখতে যান।"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তটাই বা কে? আর নীল আলোর ব্যাপারটার কথাও তো কিছু কাগজে লেখেনি!"

অনির্বাণ বলল, "আসল কথাটাই তো লেখেনি! টোবি দত্তকে নিয়েই যত কৌতূহলের সৃষ্টি। টোবি দত্তের অন্য একটা নাম আছে নিশ্চয়ই! কিন্তু সবাই টোবি দত্ত বলেই জানে। এই টোবি দত্তর বয়েস হবে পঞ্চাশ-বাহান্ন বেশ লম্বা আর শক্ত চেহারার মানুষ। এককালে এই টোবি দত্তের বাড়ি ছিল দিনহাটায়, সেখানকার স্কুলে পড়ত, সাধারণ গরিবের ছেলে, ক্লাস নাইনে পড়তে-পড়তে হঠাৎ সে একদিন উধাও হয়ে যায়। নিরুদ্দেশ। তারপর পঁয়তিরিশ বছর কেটে গেছে, কেউ তার কোনও খোঁজখবর পায়নি। হঠাৎ গত বছর সে ফিরে এসেছে এখানে। এর মধ্যে তার বাবা-মা মারা গেছেন, আত্মীয়স্বজনও কেউ নেই। টোবি দত্ত এখন দারুণ বড়লোক। বিদেশের কোনও জায়গা থেকে অনেক টাকা রোজগার করেছে।"

সন্তু বলল, "এন আর আই?"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল সব কিছুর সংক্ষেপে নাম দেওয়া চালু হয়ে গেছে। কোনটা যে কী, তা অনেক সময় বোঝা যায় না। এন আর আই মানে, যে-ভারতীয়কে বিশ্বাস করা যায় না, তাই না! নন রিলায়েব্‌ল ইন্ডিয়ান!"

অনির্বাণ হেসে বলল, "এন আর আই মানে সবাই জানে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান, যে-ভারতীয় বিদেশে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে আপনার দেওয়া মানেটাই বোধ হয় ঠিক। টোবি দত্তর রকমসকম কিছুই বোঝা যায় না। পুলিশকেও সে নাজেহাল করে দিতে পারে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "পুলিশের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক? সে কোনও অপরাধ-টপরাধ করেছে নাকি?"

অনির্বাণ বলল, "না, সেরকম কিছু করেনি। টোবি দত্ত অনেক টাকা খরচ করে বনবাজিতপুর গ্রামে মস্ত বড় একটা বাড়ি বানিয়েছে। বাড়িটা প্রায় দুর্গের মতন। বাইরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।"

কাকাবাবু বললেন, "লোকে ইচ্ছেমতন বাড়ি বানাবে, তাতে পুলিশের কী বলার আছে?"

অনির্বাণ বলল, "একটা অতি সাধারণ গ্রামে অত বড় একটা বাড়ি বানাবার কোনও মানে হয়? সে-বাড়িতে সে একা থাকে। গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে সে মেশে না। কাউকে সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। এতে কৌতূহল তো হবেই। দিনহাটার সুশীল গোস্বামী নামে একজন লোক ওই টোবি দত্তের সঙ্গে স্কুলে এক ক্লাসে পড়ত। সেই সুশীল গোস্বামী একদিন রাস্তায় টোবি দত্তকে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী রে টোবি, এতদিন কোথায় ছিলি?' টোবি দত্ত তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলেছিল, 'কে আপনি? আপনাকে আমি মোটেই চিনি না। আমার ডাকনাম

ধরে ডাকার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে?'"

কাকাবাবু বললেন, "এতে বোঝা যাচ্ছে লোকটির স্বভাব রুক্ষ ধরনের। তা হলেও তো পুলিশের মাথা গলাবার কোনও কারণ নেই।"

অনির্বাণ বলল, "সেটাও মেনে নিচ্ছি। আমি এমনই সাধারণ ভদ্রতা করে ওর সঙ্গে একদিন কথা বলতে গিয়েছিলাম। আমাকেও পাত্তা দেয়নি। তবু পুলিশের মাথা গলাবার একটা কারণ আছে। টোবি দত্তর বাড়িতে মাঝে-মাঝে রাত্তিরবেলা একটা অদ্ভুত নীল রঙের আলো জ্বলে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অদ্ভুত নীল আলো! ব্যাপারটা কী?"

অনির্বাণ বলল, "আলোটা জ্বলে ওপরের দিকে, আকাশের দিকে। দারুণ জোর আলো। দূর থেকে দেখলে মনে হয়, একটা নীল আলোর শিখা মেঘ-টেঘ ফুঁড়ে একেবারে মহাশূন্যে চলে গেছে। এমন তীব্র আলো কী করে জ্বালে তা কে জানে!"

কাকাবাবু খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে বললেন, "হুঁ, কী করে জ্বালে এবং কেন জ্বালে। আকাশে আলো দেওয়ার দায়িত্ব তাকে কে দিয়েছে?"

অনির্বাণ বলল, "ঠিক এই প্রশ্নগুলো আমার মাথাতেও এসেছিল। সেইজন্য আমি দ্বিতীয়বার টোবি দত্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম ওর বাড়িতে। দরজা খুলেই আমাকে কী বলল জানেন?"

একটু থেমে, সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে অনির্বাণ আবার বলল, "টোবি দত্ত আমাকে দেখেই বলল, গেট আউট!"

সন্তু হেসে ফেলল।

কাকাবাবু বললেন, "লোকটার সাহস আছে স্বীকার করতেই

হবে। তুমি এই জেলার পুলিশের বড় কর্তা, তোমাকে গ্রাহ্যই করল না?"

অনির্বাণ বলল, "আমারও হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আমার মুখের ওপর কেউ এরকম চোটপাট করে না! আমি বললাম, 'মশাই রেগে যাচ্ছেন কেন? আপনার কাছে এমনই দু-একটা ব্যাপার জানতে এসেছি।' তাতে সে বলল, 'আপনার সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করতে আমি রাজি নই।' তারপরেও আমি নরম করে বললাম, 'আপনার ছাদে একটা জোর আলো জ্বলে, ওই আলোটা একবার দেখে যেতে চাই।' তাতে সে বলল, 'আমার ছাদে আমি যেমন ইচ্ছে আলো জ্বালাব, তাতে আপনার কী? যাকে-তাকে আমি বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেবই বা কেন?' এই বলে সে আমার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিল!"

কাকাবাবু বললেন, "লোকটি বেআইনি কিছু বলেনি। যে-কেউ ইচ্ছে করলেই বাড়ির ছাদে আলো জ্বালতে পারে। সে আলো নীল হবে না লাল হবে, টিমটিম করে জ্বলবে কিংবা কতখানি জোরালো হবে, তা নিয়ে কোনও আইন নেই!"

অনির্বাণ বলল, "আমার সঙ্গে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার ছিল, তারা তো আমাকে এরকম অপমানিত হতে দেখে রাগে ফুঁসছিল। একজন তো রিভলভার বের করে প্রায় গুলি করতে যায় আর কি! আমি তাকে থামালাম। টোবি দত্ত লোকটা আইন জানে। সার্চ ওয়ারেন্ট ছাড়া আমি তার বাড়ির মধ্যে ঢুকতে পারব না। সে কোনও বেআইনি কাজ না করলে সার্চ ওয়ারেন্ট বের করব কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা মুখ চুন করে ফিরে এলে?"

অনির্বাণ বলল, "তা ছাড়া আর উপায় কী বলুন! টোবি দত্তর ওপর নজর রাখার জন্য আমি লোক লাগিয়েছি। তারপর একটা

পার্টিতে আমার কাছ থেকে এই ঘটনা শুনে কর্নেল সমর চৌধুরীর কৌতূহল জাগল। জানেনই তো, আমাদের এখানে কাছাকাছি আর্মির একটা বড় বেস আছে। সমর চৌধুরী চুপিচুপি হেলিকপটার নিয়ে টোবি দত্তর বাড়ির ওপর ঘুরপাক খেয়ে এসেছেন কয়েকবার। কিছুই দেখতে পাননি। হেলিকপটারটা কাছাকাছি এলেই আলোটা নিভে যায়। তারপর মিশমিশে অন্ধকার। দেখা যায় না কিছুই। গ্রামের লোক টোবি দত্তর বাড়ির আলোটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না, কিন্তু রাত্তিরবেলা ওই হেলিকপটারটা দেখলেই ভয় পেয়ে ছোটাছুটি শুরু করে!"

কাকাবাবু বললেন, "আর একখানা ইউ এফ ও ভেজাল বলে প্রমাণিত হল। ওরে সন্তু, আমাদের আর ইউ এফ ও দেখা হল না! তবে টোবি দত্তর বাড়ির নীল আলোটা একবার দেখা যেতে পারে, কী বলো!"

অনির্বাণ বলল, "আমি আপনাদের সঙ্গে করে নিয়ে যাব সেখানে।"

বিকেলবেলা কাকাবাবু সন্তুকে কোচবিহার শহরটা ঘুরিয়ে দেখালেন।

এককালে শহরটা যে বেশ সুন্দর ছিল, তা এখনও বোঝা যায়। সোজা, টানা-টানা রাস্তা, মাঝে-মাঝে একটা দিঘি, পুরনো আমলের কিছু-কিছু বাড়ি দেখলে রাজা-রানিদের আমলের কথা

মনে পড়ে। আর রাজবাড়িটা তো রূপকথার রাজাদের বাড়ির মতন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে সন্তুর মনে হল, যেন একপাল হাতির পিঠে চড়ে চলেছেন রাজার পাত্রমিত্র, একেবারে প্রথম হাতির ওপর বসে আছেন মহারাজ, মাথায় সোনার মুকুট, তাঁর কোমরে তলোয়ারের খাপে হিরে বসানো, পদাতিকরা কাড়া-নাকাড়া আর ভেঁপু বাজাচ্ছে। ইস, সন্তু কেন সেই যুগে জন্মাল না!

সন্ধেবেলা সার্কিট হাউসে ফেরার পথে কাকাবাবু বললেন, "দ্যাখ সন্তু, ওকে একটু দূরে-দূরে রাখতে হবে। সর্বক্ষণ একজন পুলিশের কর্তা সঙ্গে থাকলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা যায় না।"

পরদিন সকালে কাকাবাবুর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হওয়ার পর অনির্বাণ নিয়ে এল জিপের বদলে একটা সাদা রঙের গাড়ি, সে নিজেও পুলিশের পোশাক পরেনি, বডিগার্ডও আনেনি সঙ্গে। যেন সে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছে।

বনবাজিতপুর গ্রামটার নাম কোনও ম্যাপে না থাকলেও জায়গাটা হেলাফেলা করার মতন নয়। জঙ্গলের ধারে বেশ পুরনো একটি গ্রাম, অনেক পাকা বাড়ি আছে, তার মধ্যে কয়েকটি একেবারে ভাঙা। একসময় কিছু অবস্থাপন্ন লোকের বাস ছিল এখানে। রাস্তাটাস্তা যথেষ্ট পরিষ্কার। একটা স্কুল আছে।

গ্রামের কাছে পৌঁছে অনির্বাণ বলল, "এখানকার স্কুলের হেডমাস্টারের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। চলুন আগে তাঁর কাছে যাই, অনেক কিছু শোনা যাবে। আজ ছুটির দিন, বাড়িতেও পাওয়া যাবে তাঁকে।"

হেডমাস্টারমশাইয়ের নাম অমিয়ভূষণ দাস, তাঁর বাড়িটি কাঠের তৈরি দোতলা, সামনে ফুলের বাগান। পুলিশের বড়কর্তাকে দেখে তিনি একেবারে বিগলিত হয়ে গেলেন। কাকাবাবু আর সন্তুর নাম

উনি আগে শোনেননি, ওঁদের বিষয়ে কিছু জানেন না।

দোতলার ওপর অর্ধেকটা চাঁদের মতন বারান্দা, সেখানে নিয়ে গিয়ে তিনি বসালেন অতিথিদের। বারান্দায় অনেক বেতের চেয়ার ছড়ানো, মাঝখানে একটা শ্বেতপাথরের টেবিল, তার পায়াগুলো দেখে সন্তু চমকে উঠল। সেগুলো সব আসল হাতির পা। সন্তুর মনোযোগ দেখে অমিয়ভূষণ বললেন, "আমার ছোটভাই চা-বাগানে কাজ করে, সে ওই টেবিলটা পাঠিয়েছে।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "বলুন অমিয়বাবু, এখানকার নতুন খবর কী?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "এখানকার থানার দারোগা কাল এসে বলে গেলেন, রাত্তিরবেলা যে-জিনিসটা এখানকার আকাশে ঘুরপাক খায়, সেটা নাকি হেলিকপটার? গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করছে না। হেলিকপটার তো অনেকেই আগে দেখেছে। এখানে যেটা আসে সেটা থেকে আগুনের ফুলকি বেরোয়। তারপর হঠাৎ এক সময় অদৃশ্য হয়ে যায়।"

অনির্বাণ বলল, "গ্রামের লোকরা যাই বলুক, আপনার কী মনে হয়?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "আমার অনিদ্রা রোগ আছে, তাই ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোতে হয়। আমি বার দু-এক দেখেছি। আমি কিন্তু জিনিসটা না দেখার আগে হেলিকপটারের কথাই ভেবেছিলাম। কিন্তু চোখে দেখলাম অন্যরকম। যেন একটা উড়ন্ত হাঙর, সারা গায়ে আলো ঝলসাচ্ছে, আর মাথা ও লেজের কাছ থেকে বেরোচ্ছে ফোয়ারার মতন আগুনের ফুলকি। হেলিকপটার তো এরকম হয় না!"

অনির্বাণ বলল, "জিনিসটা এখানে তিন রাত্তির এসেছে। এখানকার আর্মির একজন কর্নেল সেই তিনবারই হেলিকপটার

নিয়ে এখানে এসেছেন, সেটা আমি চেক করেছি।"

অমিয়ভূষণ ভুরু কুঁচকে বললেন, "তিনবার ? না তো, অন্তত পাঁচ-ছ'বার এসেছে। হ্যাঁ, পাঁচবার তো নিশ্চয়ই।"

কাকাবাবু বললেন, "আর্মির হেলিকপটার ছাড়াও আবার অন্য কিছু আসে নাকি ?"

অনির্বাণ বলল, "তা সম্ভব নয়। এঁদের ভুল হচ্ছে, তিনবারই এসেছে। মাস্টারমশাই, টোবি দত্তর খবর কী ? ওর ছাদে এখনও সেই নীল আলো জ্বলে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "তা জ্বলে। আমার মনে হয় কী জানেন, টোবি দত্ত কোনও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে। অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী আছে তা হলে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "নেই ? সে কি মশাই ? আকাশে লক্ষ-কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে। তার আর কোথাও মানুষ নেই কিংবা অন্য প্রাণী নেই, শুধু পৃথিবীতেই আছে ?"

অনির্বাণ তাড়াতাড়ি ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "না, না, আমি তা বলিনি। এত গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে অনেক রকম প্রাণী তো থাকতেই পারে। কিন্তু এ-পর্যন্ত পৃথিবীর আর কোনও বৈজ্ঞানিক কোনও সন্ধান পাননি, টোবি দত্ত জেনে গেল ? আলো জ্বালিয়ে তাদের ডাকছে ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "হতেও তো পারে। একটা কথা ভাবুন তো, টোবি দত্ত যদি সত্যিই এটা আবিষ্কার করে ফেলতে পারে, তা হলে আমাদের কোচবিহারের কত নাম হয়ে যাবে। সারা পৃথিবীর বড়-বড় বৈজ্ঞানিকরা এখানে ছুটে আসবেন !"

এই সময় একজন কাজের লোক বাড়ির ভেতর থেকে

নারকোল গুঁড়ো দিয়ে চিঁড়েভাজা মাখা আর চা নিয়ে এল।

কাকাবাবু চামচে করে খানিকটা চিঁড়েভাজা মুখে দিয়ে বললেন, "বাঃ, দিব্যি খেতে তো ! অমিয়বাবু, আপনার বাড়িতে আর কে-কে আছেন ?"

অমিয়ভূষণ বললেন, "এখন বাড়ি প্রায় খালি। আমার স্ত্রী স্বর্গে গেছেন। আমার ছোটভাইয়ের কথা তো বললাম, চা-বাগানে কাজ করে। এখন আমার সঙ্গে থাকে শুধু আমার ছোট মেয়ে মণিকা।"

কাকাবাবু বললেন, "ভারী সুন্দর বাড়িটা আপনার। আপনাদের গ্রামটাও নিরিবিলি, ছিমছাম, আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছে করছে, এখানে তিন-চারদিন থেকে যাই। গ্রামে থাকার তো সুযোগ হয় না। এখানে হোটেল কিংবা ডাকবাংলোও নেই। আপনার বাড়িতে একখানা ঘর পেতে পারি কয়েক দিনের জন্য ? কিছু ভাড়াও অবশ্যই দেব।"

অমিয়ভূষণ জিভ কেটে বললেন, "ছি ছি ছি, ভাড়ার কথা তুলছেন কেন ? আপনারা অতিথি হয়ে থাকবেন। আমাদের গ্রামে যে থাকতে চাইছেন, এটাই তো আমাদের সৌভাগ্য !"

কাকাবাবু অনির্বাণের দিকে ফিরে বললেন, "তা হলে আমাদের সুটকেসদুটো সার্কিট হাউস থেকে আনাতে হবে যে !"

অনির্বাণ বলল, "সে আমি ফিরে গিয়ে পাঠিয়ে দেব। তা হলে এখন চলুন, টোবি দত্তর বাড়ির চারপাশটা একবার ঘুরে দেখি। তারপর সমর চৌধুরীর সঙ্গেও আপনার আলাপ করিয়ে দেব। বিকেলবেলা এখানে চলে আসবেন।"

কাকাবাবুরা তখনকার মতন বিদায় নিলেন অমিয়ভূষণের কাছ থেকে।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "আসবার সময় একটা ব্রিজ

পার হয়ে এসেছি। এই গ্রামের পাশে একটা নদী আছে। চলো, সেই নদীটার ধারে গিয়ে একটু বসি।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "টোবি দত্তর বাড়ি দেখতে যাবেন না ?"

কাকাবাবু বললেন, "না। শুধু-শুধু বাড়িটা দেখে কী হবে ? রাত্তিরবেলা আলোটা দেখব।"

"নদীর ধারে গিয়ে কী করবেন ?"

"কিছু করব না। নদীটা দেখব। সবসময়েই কিছু না কিছু করতে হবে নাকি ?"

গাড়িটা নিয়ে আসা হল নদীর ধারে। সরু নদী, দু'পাশে বড়-বড় পাথর, মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে স্বচ্ছ জল। স্রোত আছে। সন্তু কাছে গিয়ে এক আঁজলা জল তুলে নিয়ে দেখল বেশ ঠাণ্ডা।

কাকাবাবু একটা পাথরের ওপর বসে ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে বললেন, "আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। এর পরের লাইনগুলো কী বলো তো অনির্বাণ ?"

অনির্বাণ বলল, "এই রে, আমি তো বাংলা কবিতা পড়িনি। আমার ইংলিশ মিডিয়াম ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঙালির ছেলে হয়ে তুমি এই কবিতাটাও জানো না ? সন্তু, তুই বলতে পারবি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, 'পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি...'"

কাকাবাবু বললেন, "ওই দ্যাখ তো, এখন কে নদী পার হচ্ছে ?"

অনির্বাণ চমকে উঠে বলল, "ওই তো টোবি দত্ত !"

নদীতে হাঁটু জলের বেশি নেই, হেঁটে নদী পার হয়ে আসছে একজন লম্বামতন মানুষ, গায়ের রং কালো, মাথার চুল কাঁচা-পাকা। জিন্‌সের ওপর লাল রঙের গেঞ্জি পরা। হাতের মাস্‌ল দেখলেই বোঝা যায়, লোকটির গায়ে প্রচুর শক্তি আছে।

লোকটির সঙ্গে একটি কুকুর। খুব বড় নয়, মাঝারি, কান দুটো ঝোলা, গায়ে প্রচুর চকোলেট রঙের লোম। কুকুরটা মহা আনন্দে জলের ওপর দিয়ে লাফাচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে।

টোবি দত্ত কাকাবাবুদের বেশ কাছাকাছিই এপারে এসে উঠল। এঁদের দিকে তাকাল না একবারও। এখানে যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে, তা যেন গ্রাহ্যই করছে না সে। তার খালি পা, প্যান্ট হাঁটু পর্যন্ত গোটানো, কাঁধে ঝুলছে একটা ব্যাগ।

টোবি দত্ত ডান দিকে গিয়ে হাঁটতে লাগল নদীর ধার দিয়েই। কুকুরটাও সঙ্গে-সঙ্গে গেল খানিকটা, তারপর হঠাৎ ফিরে এল। জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে সন্তু, কুকুরটা হিংস্রভাবে ডাকতে-ডাকতে তেড়ে গেল সন্তুর দিকে।

সন্তু প্রথমটা বুঝতে পারেনি, হাসিমুখেই তাকিয়ে ছিল কুকুরটার দিকে। হাত বাড়িয়েছিল আদর করার জন্য। কিন্তু কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়াতে গেল তাকে।

সন্তু এক ঝটকায় ঠেলে দিল কুকুরটাকে।

সেটা একবার উলটে ডিগবাজি দিয়েই আবার উঠে সন্তুর বুকের দিকে এক লাফ দিল।

অনির্বাণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এ কী, কুকুরটা পাগল হয়ে গেল নাকি ?"

টোবি দত্তও থমকে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়েছে।

অনির্বাণ চেঁচিয়ে বলল, "ও মশাই, আপনার কুকুর সামলান। ছেলেটাকে কামড়ে দেবে যে !"

সন্তুর সঙ্গে কুকুরটার রীতিমত লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কুকুরটা যাতে দাঁত বসাতে না পারে, সেজন্য ওর পেটে ঘুসি মেরে-মেরে দূরে ঠেলে দিচ্ছে, কুকুরটাও ফিরে আসছে সঙ্গে-সঙ্গে। সন্তুর হাত বা পায়ে নয়, মুখেই কামড়ে দিতে চায় কুকুরটা।

কাকাবাবু প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে সোজা হয়ে বসে আছেন। একবার টোবি দত্তর সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হল। কী অসম্ভব ঠাণ্ডা আর স্থির সেই দৃষ্টি। চোখের যেন পলক পড়ে না।

টোবি দত্ত দু'বার শিস দিল। তারপর ডাকল, "ডন, ডন, কাম হিয়ার!"

কুকুরটা তাতে ভ্রূক্ষেপও করল না।

অনির্বাণ একটা বড় পাথর তুলে নিয়েও ছুঁড়ে মারতে ভয় পাচ্ছে। যদি সন্তুর মাথায় লাগে।

সন্তু একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গিয়ে জলের মধ্যে হাঁচড়-পাঁচড় করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কুকুরটা এক লাফে উঠে পড়েছে সন্তুর ঘাড়ে।

সঙ্গে-সঙ্গে পর-পর দু'বার গুলির শব্দ হল। কুকুরটা ছিটকে পড়ে গেল বেশ খানিকটা দূরে।

অনির্বাণ ঘুরে দেখল টোবির দিকে। কিন্তু গুলি সে করেনি। কাকাবাবুর হাতে রিভলভার। তাঁর নিশানা অব্যর্থ।

কাকাবাবু খানিকটা আফসোসের সুরে বললেন, "কুকুর মারতে আমার খুব খারাপ লাগে। কিন্তু পাগল হয়ে গেলে না মেরে তো উপায় নেই।"

টোবি দত্ত নদীতে নেমে গিয়ে মৃত কুকুরটাকে তুলে নিয়ে এল দু' হাতে। কাকাবাবুর সামনে এসে দাঁড়াল।

অনির্বাণ কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, "আপনি ঠিক কাজই করেছেন। দু-তিনদিন ধরে আমার এই কুকুরটা অদ্ভুত ব্যবহার করছিল। সম্ভবত ওকে কেউ বিষ খাইয়েছে। ছেলেটিকে কামড়ে দিলে খুব খারাপ হত। আমার কুকুর আগে কখনও কাউকে এইভাবে কামড়াতে যেত না।"

কাকাবাবু বললেন, "এত সুন্দর দেখতে কুকুরটা! আমি খুব দুঃখিত।"

টোবি দত্ত আর কোনও কথা না বলে সেই মরা কুকুর কোলে নিয়ে চলে গেল।

সন্তু উঠে এসেছে জল থেকে। কাকাবাবু বললেন, "দাঁতটাঁত বসাতে পারেনি তো? শরীরের কোথাও রক্ত বেরিয়েছে?"

সন্তু বলল, "না, সেসব কিছু হয়নি।"

অনির্বাণ বলল, "তবু একবার ডাক্তার দেখানো দরকার। পাগলা কুকুরের জিভের লালা লাগলেও মহা বিপদ হতে পারে। সন্তু, তোমাকে ইঞ্জেকশন নিতে হবে চোদ্দটা!"

কাকাবাবু বললেন, "আজকাল চারটে নিলেও চলে। একজন ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই উচিত। কী ঝামেলা বলো তো, এমন চমৎকার নদীর ধারে বসে আছি, এমন সময় একটা পাগলা কুকুর এসে উপদ্রব শুরু করল!"

সন্তুর জামা-প্যান্ট সব জলে ভিজে গেছে। সে মুখে আর গায়ে হাত বুলিয়ে দেখছে, কোথাও কুকুরটা আঁচড়ে দিয়েছে কিনা!

অনির্বাণ বলল, "আমি তো দারুণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কুকুরটা যদি সন্তুকে কামড়ে শেষ করে দিত? টোবি দত্ত একটা পাগলা কুকুর সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে!"

কাকাবাবু বললেন, "এই ব্যাপারে অন্তত আমি ওকে দোষ দিতে পারি না। পাগলা কুকুর তো মনিবকেও কামড়ে দেয়। ও নিশ্চয়ই জানত না কুকুরটা সত্যি পাগল হয়ে গেছে। ওর ধারণা, কুকুরটাকে কেউ বিষ খাইয়েছে।"

অনির্বাণ বলল, "ওর কুকুরকে কে বিষ খাওয়াবে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি কী করে জানব। যাই হোক, চলো আগে কোনও ডাক্তারের কাছে যাই।"

কোচবিহার শহরের দিকে না গিয়ে গাড়ি ছুটল অন্যদিকে। হাইওয়ের পাশেই এক জায়গায় সেনাবাহিনীর বিশাল ছাউনি। সেখানে ওদের নিজস্ব পোস্ট অফিস, হাসপাতাল সব আছে।

সেই হাসপাতালের ডাক্তার শৈবাল দাশগুপ্তের সঙ্গে অনির্বাণের অনেকদিনের চেনা। হাসপাতালে না গিয়ে শৈবাল দাশগুপ্তের বাড়িতে যাওয়া হল। সেখানে গিয়ে শোনা গেল, তিনি জলপাইগুড়ি শহরে গেছেন, একটু পরেই ফিরবেন।

শৈবাল দাশগুপ্তের স্ত্রী মালবিকাও ডাক্তার। তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। খবর পেয়ে তিনি এসে সন্তুকে পরীক্ষা করলেন ভাল করে। তারপর বললেন, "দেখুন, যতদূর মনে হচ্ছে, ছেলেটির কোনও বিপদ হবে না, ইঞ্জেকশনের দরকার নেই। তবে, আমি তো এই রোগের চিকিৎসা করি না, উনি এসে আর-একবার দেখবেন। আপনারা বসুন না !"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল সমর চৌধুরীকে একবার খবর দেওয়া দরকার। আপনার বাড়ি থেকে টেলিফোন করা যায় না ?"

মালবিকা বললেন, "হ্যাঁ, কেন যাবে না! আপনিই ফোন করুন।"

এর মধ্যেই এসে পড়লেন ডাক্তার শৈবাল দাশগুপ্ত। ফরসা, পাতলা চেহারা, হাসিখুশি মানুষ। সব ব্যাপারটা শুনে তিনি

সন্তুকে বললেন, "জামা খুলে শুয়ে পড়ো। আমি আর-একবার দেখি !"

তিনি সন্তুকে পরীক্ষা করে দেখতে-দেখতেই একটা ফোন এল। সেই ফোনে কথা বলে এসে তিনি জানালেন, "যাক, ভালই হয়েছে। এই ঘটনাটা বনবাজিতপুরে ঘটেছে তো ? সেখানকার টোবি দত্ত নামে একজন লোক একটা কুকুরের মাথা কেটে নিয়ে এসে হাসপাতালে জমা দিয়েছেন। কুকুরটা পাগল হয়েছিল কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে চান। হাসপাতাল থেকে আমাকে জানাল। টোবি দত্ত ঠিক কাজই করেছেন। কুকুর হঠাৎ পাগল হয়ে গেলে সে-বাড়ির প্রত্যেকটি লোকের ইঞ্জেকশন নেওয়া দরকার। কাউকে আদর করে চেটে দিলেও তার জলাতঙ্ক রোগ হতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি যে খুব ভয় দেখাতে শুরু করলেন !"

ডাক্তার বললেন, "না, না, সেরকম ভয়ের কিছু নেই। কালকেই কুকুরের মাথাটা টেস্ট করে জানা যাবে। আজ আমি একে অন্য একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।"

এই ডাক্তার-দম্পতির এক ছেলে দার্জিলিংয়ে পড়ে। সন্তুরই সমবয়েসী। মালবিকা দাশগুপ্ত সন্তুর ভিজে জামা-প্যান্ট ছাড়িয়ে জোর করে নিজের ছেলের প্যান্ট, শার্ট পরিয়ে দিলেন। সন্তুর গায়ে দিব্যি ফিট করে গেল। তবে অন্য লোকের জামাটামা পরলে নিজেকেও অন্যরকম মনে হয়।

অনির্বাণ এর মধ্যে ফোন করল কর্নেল সমর চৌধুরীকে। তিনি সবাইকে অনুরোধ করলেন তাঁর বাড়িতে চলে আসতে। ওখানেই দুপুরের খাওয়াদাওয়া হবে।

ডাক্তার-দম্পতি সেখানে যেতে চান না। তাঁদের অন্য কাজ

ঘুমিয়ে পড়ে। কেউ তো সারারাত জেগে বসে থাকে না। হয়তো ভোর রাতে কিছু একটা ঘটে।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই কি সারারাত এখানে বসে থাকতে চাস নাকি ?"

সন্তু বলল, "সত্যি যদি ওই লোকটা মহাকাশের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে, একটা ইউ এফ ও আসে, তা হলে কিন্তু দারুণ ব্যাপার হয় !"

এই সময় আলোটা বেঁকতে শুরু করল। এতক্ষণ আলোটা সরলরেখায় স্থির হয়ে ছিল, এবার নামতে লাগল নীচের দিকে। এদিকেই নামছে, এক সময় সন্তু আর কাকাবাবুকে ধাঁধিয়ে দিল।

কাকাবাবু বলে উঠলেন, "সন্তু, শুয়ে পড়, মাটিতে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়।"

কয়েক মুহূর্তের জন্য জায়গাটা দিনের আলোর চেয়েও বেশি আলোকিত হয়ে গেল। আলোটা কিন্তু এক জায়গায় থেমে রইল না। সন্তু আর কাকাবাবুর পিঠের ওপর দিয়ে সরে গেল নদীর ওপারের জঙ্গলে। সেখানে আলোটা কেঁপে-কেঁপে যেন জায়গা করে নিচ্ছে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় আলোর সুড়ঙ্গের মতন হয়ে গেল। চলে গেল অনেক দূর পর্যন্ত।

কাকাবাবু উঠে বসে গায়ের জামা থেকে ধুলো ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, "ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মনে হল যেন আমাদের ওপর আলো ফেলে তারপর গুলি চালাবে !"

সন্তু বলল, "আমাদের দেখতে পেয়েছে নিশ্চয়ই !"

জায়গাটা আবার অন্ধকার হয়ে গেছে। সন্তু আর কাকাবাবু সরে গেলেন। আলোটা এখন জঙ্গলের মধ্যে স্থির হয়ে রয়েছে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আলো ফেলে কি কাউকে রাস্তা দেখানো হচ্ছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে দেখা যাক, কেউ আসে কিনা !"

জঙ্গলের দিক থেকে কেউ এল না, কিন্তু আকাশে একটা শব্দ শোনা গেল। ফট ফট ফট ফট শব্দ, সেইসঙ্গে এগিয়ে আসছে একটা আলো।

সন্তু আর কাকাবাবু অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে রইলেন। আরও কাছে এগিয়ে আসার পর বোঝা গেল, সেটা একটা হেলিকপটার। কিন্তু সেটাকে বেশি আলো দিয়ে সাজানো হয়েছে। আর সেটা থেকে মাঝে-মাঝে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে যাচ্ছে আকাশে। সেইজন্যই সেটাকে দেখে ভয়ঙ্কর কিছু মনে হচ্ছে।

সন্তু আবিষ্ট গলায় বলল, "ইউ এফ ও !"

কাকাবাবু বললেন, "ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে !"

টোবি দত্তর বাড়ির আলোটা এবার আবার ওপরের দিকে উঠেই নিভে গেল।

সন্তু বলল, "ক্যামেরার লেন্সে ওটাকে ঠিক একটা আগুনের পাখির মতনই মনে হচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "ইস, একটা বাইনোকুলার আনা উচিত ছিল। আরও ভাল করে দেখা যেত।"

আগুনের পাখিটা টোবি দত্তর বাড়ির ওপর চক্কর দিল দু-তিনবার। বেশি নীচে নামতে পারবে না, কারণ দোতলা বাড়ির চেয়েও উঁচু-উঁচু গাছ রয়েছে চারপাশে।

হঠাৎ সেই আগুনের পাখিটারও সব আগুন আর আলো নিভে গেল, শব্দও থেমে গেল ! আবার সব দিক নিঃশব্দ, অন্ধকার।

সন্তু বলল, "ওটা ছাদে নামছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ওপরে থেমে আছে। চুপ করে শোন,

আছে। সমর চৌধুরী টেলিফোনে ওঁদের সঙ্গেও কথা বললেন, তবু মাফ চেয়ে নিলেন ওঁরা।

একটু পরেই আর-একটা ফোন এল। রিসিভার তুলে একটুক্ষণ কথা বলেই রেখে দিলেন শৈবাল দাশগুপ্ত। মুখটা বিকৃত করে বললেন, "আবার একটা খুনের কেস এসেছে হাসপাতালে। একজন লোককে গলা মুচড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।"

অনির্বাণ বলল, "তৃতীয় খুন!"

কর্নেল সমর চৌধুরীর বাংলোটি প্রকাণ্ড। একতলা-দোতলায় একই রকম গোল বারান্দা, সামনের বাগানে একদিকে ফুলের গাছ, অন্যদিকে ফলের গাছ। বাইরের লোহার গেট থেকে বারান্দার সিঁড়ি পর্যন্ত লাল সুরকির রাস্তা। বাগানে একটা ঘোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন কর্নেল সমর চৌধুরী। তাঁকে দেখলে বাঙালি বলে মনে হয় না। কাবুলিওয়ালাদের মতন লম্বা-চওড়া চেহারা, ফরসা রং, নাকের নীচে মোটা থেকে সরু হয়ে আসা মিলিটারি গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। তিনি পরে আছেন একটা ড্রেসিং গাউন, দাঁত দিয়ে কামড়ে আছেন পাইপ।

কাকাবাবুদের দলটিকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, "আসুন, আসুন! আপনিই মিস্টার রায়চৌধুরী? আপনি খোঁড়া লোক হয়েও পাহাড়-পর্বতে ওঠেন শুনেছি। আশ্চর্য

ব্যাপার! কী করে পারেন?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি কিন্তু অনেক কিছুই পারি না। কেউ তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে পারি না। তাড়াতাড়ি কোনও সিঁড়ি দিয়ে নামতে-উঠতে পারি না। গাড়ি চালাতে পারি না!"

অনির্বাণ বলল, "রিভলভারে কী সাঙ্ঘাতিক টিপ। এরকম আমি আগে দেখিনি। ঠিক অরণ্যদেবের মতন!"

সমর চৌধুরী ভুরু তুলে বললেন, "তাই নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "খোঁড়া লোকদের হাত দুটোই তো সম্বল।"

সমর চৌধুরী বললেন, "কত লোকেরই তো দুটো হাত আর দুটো পা থাকে, কিন্তু তাদের কি আপনার মতন সাহস থাকে?"

অনির্বাণ সন্তুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, "এই ছেলেটিরও দারুণ সাহস। কীভাবে একটা পাগলা কুকুরের সঙ্গে লড়ে গেল!"

সমর চৌধুরী বললেন, "অনির্বাণ, তুমি লোকটাকে অ্যারেস্ট করলে না কেন? একটা পাগলা কুকুর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল!"

অনির্বাণ বলল, "ব্যাপারটা তো আমাদের চোখের সামনে ঘটল। আমরা ওপরে বসে ছিলাম, আর সন্তু ছিল জলের ধারে। কুকুরটা যে হঠাৎ ওইভাবে ফিরে এসে সন্তুকে আক্রমণ করবে, তা আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। কুকুরের মালিক কোনও ইশারা-ইঙ্গিত করেনি। সুতরাং মালিককে দোষ দেওয়া যায় না।"

সমর চৌধুরী ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, "তুমি অন্য কোনও ছুতোয় ওকে ধরতে পারো না? থানায় নিয়ে গিয়ে ভাল করে পেটালেই ওর পেট থেকে সব কথা বেরিয়ে পড়বে। ব্যাটার নিশ্চয়ই কোনও বদ মতলব আছে। রাত্তিরবেলা ওসব

আলো-ফালো জ্বেলে কী করে ?"

অনির্বাণ বলল, "আপনারা কি মনে করেন পুলিশের অঢেল ক্ষমতা ? নির্দিষ্ট অভিযোগ না পেলে অ্যারেস্ট করব কী করে ? কোর্টে তো নিতেই হবে, তখন জজসাহেব আমাদের ধমকে দেবেন !"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল সাহেব, আপনি হেলিকপ্টার নিয়ে গিয়ে কিছু দেখতে পাননি ?"

সমর চৌধুরী বললেন, "কিচ্ছু না ! লোকটা মহা ধুরন্ধর। আমার চপারের আওয়াজ পেলেই সব কিছু নিভিয়ে দেয়। তখন ঘুটঘুটে অন্ধকার। আর কিছুই দেখা যায় না। শুধু-শুধু পণ্ডশ্রম।"

"আপনি ক'বার গিয়েছিলেন ?"

"দু'বার না তিনবার ? হ্যাঁ, তিনবার।"

"গ্রামের লোক বলছে অন্তত পাঁচবার।"

"তাই বলছে ? আরও বাড়াবে। এর পর বলবে সাতবার, তারপর দশবার। গ্রামের লোক তো সব কিছুই বাড়িয়ে বলে।"

"আবার যাবেন ?"

"না, গিয়ে তো কোনও লাভ হচ্ছে না। শুধু-শুধু তেল পুড়িয়ে কী হবে ! তবে আপনি যদি যেতে চান, তা হলে একবার নিয়ে যেতে পারি।"

"সে পরে ভেবে দ্যাখা যাবে। আজ রাত্তিরে আমি আলোটা দেখি।"

অনির্বাণ বলল, "আমাকে কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। আপাতত আমি টৌবি দত্তকে নিয়ে মাথা ঘামাতে পারছি না। সে কোনও ক্রাইম করেনি। কিন্তু এই পর-পর খুনের ঘটনা খুব ভাবিয়ে তুলেছে। খুন আর অস্বাভাবিক মৃত্যু হচ্ছে বিভিন্ন গ্রামে।

কিন্তু ধরনটা এক। কোচবিহারে এরকম খুনটুন আগে হত না। শান্ত জায়গা।"

কর্নেল চৌধুরী তাড়াতাড়ি খাবারের ব্যবস্থা করলেন। খেয়েই অনির্বাণ কাকাবাবুদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। ওঁদের বনবাজিতপুরে পৌঁছে দিয়ে সে ফিরে গেল কোচবিহারে। সন্ধের সময় গাড়ির ড্রাইভার সুটকেস দুটো দিয়ে যাবে।

হেডমাস্টারমশাই এর মধ্যেই দোতলার একখানা ঘর গুছিয়ে রেখেছেন। যে-কোনও জিনিসের দরকার হলে কাজু নামে একজন ভৃত্যকে ডাকলেই সে ব্যবস্থা করবে। কাকাবাবুদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

পাশাপাশি দু'খানা খাট। তার একটাতে শুয়ে পড়ে কাকাবাবু বললেন, "আজ বোধ হয় রাত জাগতে হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না। সন্তু, শুয়ে পড়। তোর জ্বরটর আসছে না তো ?"

সন্তু বলল, "না। আমার কিচ্ছু হয়নি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুই জলের মধ্যে ছিলি তো, তাতে খানিকটা সুবিধে হয়েছে। কুকুরটার লালার বিষ তোর গায়ে লাগতে পারেনি। আচ্ছা সন্তু, তুই টৌবি দত্তকে তো দেখলি। দেখে তোর কী ধারণা হল ?"

সন্তু বলল, "সায়েন্টিস্ট বা বিজ্ঞানী মনে হল না।"

"কেন ? বিজ্ঞানীরা খানিকটা আধ-পাগলা কিংবা আপন-ভোলা ধরনের হয় বলে তোর ধারণা ? সে তো গল্পের বইয়ের চরিত্র। একালের বড়-বড় বিজ্ঞানীরা খুব ডিসিপ্লিন্‌ড হয়। তাদের চেহারা কিংবা সাজপোশাকও হয় সাধারণ মানুষের মতন।"

"তবু কেন যেন মনে হল, জ্ঞানী লোক নয়।"

"বিদেশ থেকে অনেক টাকা নিয়ে ফিরেছে। বিদেশে কী কাজ

কে যেন কী বলছে !"

মনে হল, সেই হেলিকপটার কিংবা সেইরকম জিনিসটা থেকে কেউ চেঁচিয়ে কিছু বলল। টোবি দত্তর ছাদ থেকেই কেউ কিছু উত্তর দিল। মাত্র এক-দেড় মিনিটের ব্যাপার। হেলিকপটার শূন্যে এক জায়গায় থেমে থাকতে পারে না।

তারপরই খানিকটা দূরে শোনা গেল ফট-ফট শব্দ। আলো না জ্বেলেই সেটা আবার উড়তে শুরু করেছে। একটুক্ষণের মধ্যেই মিলিয়ে গেল দিগন্তে!

বেশ কয়েক মিনিট চুপ করে রইলেন কাকাবাবু। তারপর উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, "কী ব্যাপারটা হল বল তো ?"

সন্তু বলল, "সমর চৌধুরী মাত্র তিনবার হেলিকপটার নিয়ে এসেছিলেন। গ্রামের লোক দেখেছে অন্তত পাঁচবার। আজ সমর চৌধুরীর আসবার কোনও কথাই নেই। আমার মনে হয়, আর-একজন কেউ আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ছাড়া আর কার কাছে হেলিকপটার থাকবে ?"

সন্তু বলল, "তা হলে এটা হেলিকপটার নয়, অন্য কিছু !"

কাকাবাবু বললেন, "তুই এখনও ইউ এফ ও'র কথা ভাবছিস ?"

সন্তু বলল, "ওরা যেন কী কথা বলল, আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না।"

কাকাবাবু বললেন, "ভাল করে শুনতেও পাইনি। ওইটুকু সময়ের মধ্যে ওরা কী এমন কথা বলবে ? সব ব্যাপারটাই আমার কাছে ধাঁধার মতন লাগছে।"

সন্তু বলল, "সব যখন অন্ধকার হয়ে গেল, তখন আকাশের ওই জিনিসটা থেকে টোবি দত্তর ছাদে কোনও জিনিস নামিয়ে দিয়ে যায়নি তো ? কিংবা কোনও লোক নেমেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আজ আর কিছু জানা যাবে না। চল, এবার ফেরা যাক !"

হাঁটতে শুরু করে সন্তু বলল, "কাকাবাবু, তুমি যেটাকে হেলিকপটার বলছ, সেটা যখন আগুন ছড়াতে-ছড়াতে উড়ে এল, তখন আমার বুকটা কাঁপছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ওটা আমাদের পৃথিবীর কিছু নয়, আরও দূর থেকে আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে পৃথিবীতে আমরাই প্রথম স্বচক্ষে অন্য কোনও গ্রহের বায়ুযান দেখলাম ? কল্পবিজ্ঞানের গল্প নয়, সত্যি-সত্যি ? কিন্তু সন্তু, হেলিকপটারের ফট-ফট ফট-ফট শব্দটা যে লুকনো যায় না ?"

সন্তু বলল, "ওদের কোনও বায়ুযানে একই রকম শব্দ হতে পারে। টোবি দত্ত সেইজন্যই আকাশে আলো দেখায়।"

কাকাবাবু বললেন, "পৃথিবীতে এত মানুষ থাকতে টোবি দত্তর সঙ্গেই বা শুধু অন্য গ্রহের প্রাণীদের ভাব হতে যাবে কেন ?"

সন্তু বলল, "আমি একবার ওর ছাদে উঠে দেখে আসব ?"

কাকাবাবু চমকে উঠে বললেন, "তুই ওর ছাদে উঠবি কী করে ?"

সন্তু বলল, "চেষ্টা করে দেখতে পারি। টোবি দত্ত ওর বাড়িতে কাউকে ঢুকতে দেয় না। এখন চুপিচুপি দেখে আসা যায়। ওর

করত সেটা কেউ জানে না।"

"স্মাগলার হতে পারে।"

"সেরকম একটা সম্ভাবনা আছে বটে! এখান থেকে অন্য দেশের বর্ডার খুব দূরে নয়। কিন্তু স্মাগলার হলে রাত্তিরবেলা ছাদে ওরকম আলো জ্বালিয়ে রাখবে কেন? ওদের তো অন্ধকারেই সুবিধে।"

"অন্য স্মাগলারদের কাছে নিশ্চয়ই সিগন্যাল পাঠায়। তারা ওই আলো দেখে বুঝতে পারবে যে ঠিক সময় হয়েছে।"

"তাতে যে পুলিশেরও নজর পড়বে। যেমন অনির্বাণরা খোঁজখবর নিচ্ছে। নিশ্চয়ই আশেপাশে পাহারাও রেখেছে।"

এই সময় দরজার কাছে একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েস, একটা ডুরে শাড়ি পরা। এক হাতে খানিকটা আচার, তাই চেটে-চেটে খাচ্ছে।

একটুক্ষণ সে এমনই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বলল, "এই, তোমার নাম বুঝি সন্তু?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। তুমি জানলে কী করে?"

মেয়েটি বলল, "বাঃ, আমি বুঝি বই পড়ি না? কাকাবাবুকে তো দেখেই চিনতে পেরেছি। সবুজ দ্বীপের রাজা-তে এইরকম ছবি ছিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি নিশ্চয়ই মণিকা?"

মেয়েটি মুখ ফিরিয়ে বলল, "আপনি কী করে জানলেন?"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "আমি বই না পড়েও জানতে পারি।"

মণিকা সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তুমি আচার খাবে? খুব ভাল কুলের আচার। আমি নিজে বানিয়েছি।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, খেতে পারি।"
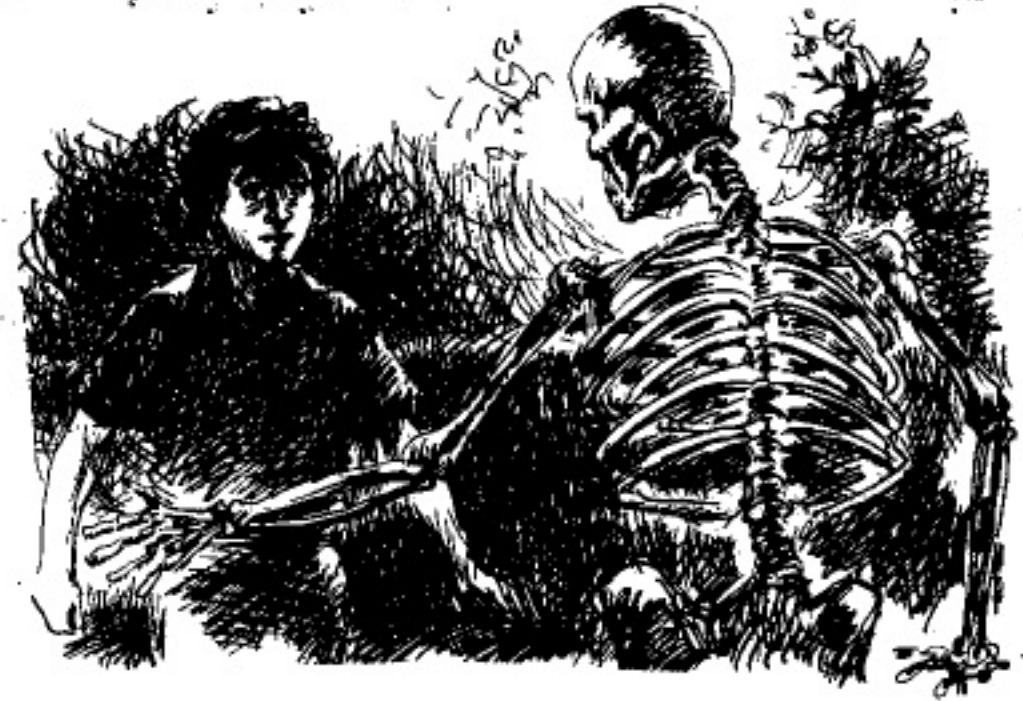
কাকাবাবু বললেন, "আমায় দেবে না?"

মণিকা বলল, "যাঃ, বৃদ্ধ লোকেরা আচার খায় নাকি?"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, তুমি আমাকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিলে? আমি কিন্তু ততটা বৃদ্ধ হইনি। তা ছাড়া তুমি জানো না, বয়স্ক লোকদের অনেক ছেলেমানুষি লোভ থাকে। আমি আচার খেতে খুব ভালবাসি।"

মণিকা বলল, "আমার বাবা খায় না। একটু খেলেই দাঁত টকে যায়। অবশ্য আমার বাবা তোমার মতন হিমালয় পাহাড়েও ওঠেনি, জাহাজে করে সমুদ্রেও যায়নি।"

মণিকা এক ছুটে গিয়ে একটা বাটিতে অনেকটা আচার নিয়ে এল। সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুও সেই আচার তারিয়ে-তারিয়ে খেতে লাগলেন।

মেয়েটির মুখখানার মতন গলার আওয়াজও খুব মিষ্টি। কিন্তু তার তৈরি আচার বেশ ঝাল।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে সে বলল, "তোমরা বুঝি এখানে কোনও ডাকাত ধরতে এসেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "না গো, মণিকা, আমরা এমনিই তোমাদের বাড়িতে থাকতে এসেছি। তোমাদের এখানকার আকাশে রাত্তিরবেলা কী যেন দেখা যায়, সেটা দেখতে এসেছি। তুমি সেটা দেখেছ?"

চোখ-মুখ ঘুরিয়ে মণিকা বলল, "হ্যাঁ দেখেছি। মস্ত বড়, জটায়ু পাখির মতন, সারা গায়ে আলো, মাঝে-মাঝে পাখা ঝাপটায় আর মুখ দিয়ে আগুন ছড়ায়। আর কী দারুণ শব্দ হয়, আমি ভয়ে চোখ বুজে ফেলেছিলুম!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুমি কখনও হেলিকপটার দেখেছ, মণিকা?"

মণিকা বলল, "তাও দেখেছি। দিনহাটায় মামাবাড়িতে গেছিলাম, সেখানে একজন মন্ত্রী এসেছিলেন হেলিকপটারে, খেলার মাঠে নেমেছিল। আমাদের এই পাখিটা কিন্তু সেরকম মোটেই না। সবাই বলে, এই পাখিটা আসে মঙ্গলগ্রহ থেকে। ওর পিঠে বেঁটে-বেঁটে মানুষ বসে থাকে। আমি অবশ্য মানুষগুলো দেখিনি।"

সন্তু আবার বলল, "মঙ্গলগ্রহের বেঁটে-বেঁটে মানুষরা তোমাদের গ্রামে কী করে?"

মণিকা বলল, "তারা টৌবি দত্তর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সেইজন্যই তো ছাদে আলো জ্বেলে রাখে।"

"তোমাদের বাড়ি থেকে টৌবি দত্তর ছাদের আলোটা দেখা যায়?"

"না, গাছপালার আড়াল হয়ে যায়। পুকুরধারে গেলে দেখা যায়। বড় রাস্তায় গেলেও দেখা যায়। আরও অনেক জায়গা

থেকে দেখতে পারো।"

"টৌবি দত্তর বাড়ির একেবারে কাছে যাওয়া যায় না?"

"সবাই যেতে ভয় পায়। রাত্তিরবেলা বন্দুকধারী দরোয়ান ঘুরে বেড়ায়। কেউ কাছে গেলেই গুলি করে মেরে ফেলবে।"

"এ-পর্যন্ত একজনকেও মেরেছে?"

"না, তা মারেনি অবশ্য। তবু সবাই ভয় পায়।"

"আমরা আজ রাত্তিরে ওই আলোটা দেখতে যাব। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?"

"না গো, কী করে যাব। বাবা বারণ করেছেন। আলোটা জ্বলে রাত বারোটার সময়, ওই সময় মেয়েদের বাইরে বেরোতে নেই। অনেকে বলে, মঙ্গলগ্রহের লোকরা ধরে নিয়ে যেতে পারে। আমার কিন্তু ইচ্ছে করে, ওরা আমাকে ধরে নিয়ে যাক। তা হলে বেশ মঙ্গলগ্রহটা দেখে আসা যাবে!"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "তারপর যদি ওরা তোমাকে আর না ছাড়ে?"

মণিকা বলল, "ইস, অত সহজ নাকি? সে আমি ঠিক ফিরে আসব!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মণিকা, তুমি কলকাতায় গিয়েছ কখনও?"

মণিকা বলল, "না, এখনও যাইনি। শুধু দু'বার শিলিগুড়ি গেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কলকাতা দেখার আগেই মঙ্গলগ্রহ ঘুরে আসতে চাও?"

মণিকার সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ গল্প হল।

সন্ধের সময় অনির্বাণের গাড়িটা নিয়ে এল সুটকেস দুটো। গাড়ির ড্রাইভার বলল যে, সে এখানেই থেকে যাবে।

কেউ তার গলাটা মুচড়ে ভেঙে দিয়েছে। কোনও দৈত্য-দানব ছাড়া মানুষের পক্ষে ওরকম গলা মুচড়ে ভাঙা সম্ভব নয়। মৃত লোকটির গলায় আঙুলের দাগ, তাও মানুষের মতন নয়, সরু-সরু লম্বা-লম্বা।"

মালবিকা বললেন, "থাক, সক্কালবেলাতেই খুন-জখমের কথা বলতে হবে না।"

কাকাবাবু কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকালেন মালবিকার দিকে।

খাওয়ার টেবিলে বসার একটু পরেই হাজির হল অনির্বাণ মণ্ডল। এসেই সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, "কাল সেই আলো দেখতে পেয়েছিলেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি।"

তারপর তিনি টোবি দত্তর বাড়ির ছাদে সন্তু যে উঠেছিল, সেই অংশটা বাদ দিয়ে শুধু আলো আর আগুন-পাখির মতন হেলিকপ্টার দেখার অংশটুকু শোনালেন।

সন্তু জানে, কাকাবাবু যখন কোনও ঘটনা বাদ দিয়ে বলতে চান, তা হলে তখন চুপ করে থাকতে হয়।

কিন্তু মণিকা তো তা জানে না। সে বলল, "বাঃ, আর আমি যে ওই পাহারাদারটাকে বাইরে বের করে আনলাম?"

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, মণিকাও কাল অনেক সাহস দেখিয়েছে। সেসব পরে শুনবে। আচ্ছা অনির্বাণ, তুমি যে বলেছিলে, পুলিশের লোক সর্বক্ষণ টোবি দত্তর বাড়ির ওপর নজর রাখছে। কাল রাত্তিরে কেউ ছিল?"

অনির্বাণ বলল, "থাকবার তো কথা। কেন, আপনারা তাকে দেখতে পাননি?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা ওখানে অনেকক্ষণ দেখেছি। বাড়িটার চারপাশ ঘুরেছি। কিন্তু পুলিশের কোনও পাত্তা পাইনি।"

অনির্বাণ বলল, "তা হলে সে ব্যাটা নিশ্চয়ই ফাঁকি মেরে বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়েছে! কাল ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছিল। দিন আর রাতে দু'জনের ডিউটি থাকে পালা করে। খবর নিয়ে দেখতে হবে, কে ফাঁকি মেরেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তর ওই আলোটা কতদিন ধরে জ্বলছে?"

অনির্বাণ বলল, "মাসদেড়েক হবে। প্রায় প্রতিদিনই জ্বলে। খুব ঝড়-বৃষ্টি হলে বন্ধ থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের লোক যদি প্রত্যেকদিন নজরে রাখত তা হলে বলতে পারত যে, হেলিকপ্টার ওই বাড়ির ওপর ঠিক কতবার গিয়েছিল। যেমন, কাল রাতেও যে এসেছিল, পুলিশের খাতায় তার কোনও রেকর্ড থাকবে না।"

অনির্বাণ বলল, "আমিও তো ভাবছি। কর্নেল সমর চৌধুরী বললেন, উনি আর যাবেন না। অথচ কাল রাতেই আবার গেলেন কেন?"

সন্তু মুখ তুলে কিছু বলার জন্য কাকাবাবুর দিকে তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "সমর চৌধুরী কাল যাননি, অন্য কেউ গেছে। আমার মতে যেটা হেলিকপ্টার, সন্তুর মতে সেটা অন্য কোনও বায়ুযান কিংবা মহাকাশযানও হতে পারে।"

মালবিকা উৎসাহের সঙ্গে বললেন, "ইউ এফ ও? সত্যি-সত্যি ইউ এফ ও দেখেছেন?"

মণিকা বলল, "ওটা একটা আগুনের পাখি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু ওর ক্যামেরায় অনেক ছবি তুলেছে। সেই ফিল্মগুলো ডিভেলাপ করলে ঠিকঠাক বোঝা যাবে। এখন একবার সমর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করা যাবে?"

কাকাবাবুদের কাজে লাগতে পারে।

এ-বাড়িতে খাওয়াদাওয়া চুকে যায় রাত ন'টার মধ্যে। হেডমাস্টারমশাই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েন। সন্তু আর কাকাবাবুও নিজেদের ঘরে এসে শুয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর ঠিক পৌনে বারোটার সময় তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

গাড়িটা সঙ্গে নিতে চাইলেন না কাকাবাবু। হেঁটেই যাবেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকে বুঝে নিয়েছেন কোন দিক দিয়ে যেতে হবে। অনির্বাণ যে বলেছিল টোবি দত্ত নতুন বাড়ি বানিয়েছে, তা ঠিক নয়। এই গ্রামে ছিল টোবি দত্তর মামাবাড়ি। তার মামারা ছিলেন বেশ ধনী। কিন্তু এই মামারা টোবি দত্তের মায়ের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন না। একবার টোবি দত্তর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে টোবির মা এখানে সাহায্য চাইতে এসেছিলেন। ছোট ছেলে টোবিও মায়ের সঙ্গে ছিল তখন, কিন্তু ওর বড়মামা অপমান করে মাকে তাড়িয়ে দেন। তারপর বহুদিন কেটে গেছে। সেই মামার বংশধররা এখন খুবই গরিব। আর টোবি দত্ত বিদেশ থেকে বহু টাকা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। সেই মামাদের বাড়িটাই কিনে নিয়েছে সে। সারিয়ে ঠিকঠাক করেছে ভাঙা বাড়িটাকে।

পুকুরের ধার দিয়ে রাস্তা। খানিকটা গেলে বড় রাস্তায় পড়া যাবে। চতুর্দিকে জমাট অন্ধকার। আকাশেও চাঁদ নেই। দিনের বেলা বেশ গরম ছিল, এখন বাতাসে ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। রাত বারোটায় সমস্ত গ্রাম ঘুমিয়ে পড়ে। কোথাও কোনও শব্দ নেই।

হঠাৎ পেছনে কিসের শব্দ শুনে এরা দু'জন ঘুরে দাঁড়াল। কে যেন ছুটে আসছে। কাকাবাবু পকেটে হাত দিয়ে অন্য হাতে টর্চ জ্বালালেন। একটু পরেই দেখা গেল মণিকাকে।

সে হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, "আমি যাব তোমাদের সঙ্গে!"

কাকাবাবু বললেন, "সে কী, তোমার বাবা যে বারণ করেছেন?"

মণিকা বলল, "বাবা তো ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালের আগে জাগবে না। কিছু জানতে পারবে না।"

কাকাবাবু মাথা নাড়িয়ে বললেন, "তা হয় না, মণিকা। তোমার বাবার অনুমতি ছাড়া তোমাকে আমরা সঙ্গে নিতে পারি না।"

মণিকা বলল, "চলো না। কিচ্ছু হবে না। বলছি তো, বাবা টেরও পাবে না!"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, সেটা অন্যায়। কাল বরং তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে আমরা অন্য একটা জায়গায় যাব।"

মণিকা ছটফটিয়ে বলল, "তোমরা বেশ মজা করতে যাচ্ছ। আর আমি বাড়িতে একলা-একলা শুয়ে থাকব? আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

কাকাবাবু ওর পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "লক্ষ্মীটি, আজ গিয়ে ঘুমোও। দেখো, কাল কিছু একটা হবে।"

খুব অনিচ্ছার সঙ্গে শরীর মোচড়াতে-মোচড়াতে ফিরে গেল মণিকা।

কাকাবাবুরা এগিয়ে গেলেন বড় রাস্তার দিকে। তাঁর ক্রাচ দুটির তলায় যদিও রাবার লাগানো আছে, তবু এই নির্জনতার মধ্যে একটু-একটু শব্দ হচ্ছে। সন্তুর পায়ে টেনিস-শু, সে পরে আছে হাফপ্যান্ট আর টি-শার্ট।

রাস্তায় কোনও মানুষজন নেই, একটা কুকুর ওদের দিকে ছুটে এসেও কাকাবাবুর ক্রাচ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

টোবি দত্তর বাড়িটা ফাঁকা জায়গায়। দু'পাশে অনেকটা জমি, পেছন দিকে সরু নদীটার ওপাশেই জঙ্গল। ছাদে এখনও আলো জ্বলেনি, গোটা বাড়িটাই অন্ধকার।

মূল বাড়িটা থেকে খানিকটা সামনে একটা লোহার গেট, তার পাশে ছোট্ট গুমটি ঘর, ভেতরে টিমটিম করে লণ্ঠন জ্বলছে। সেখানে কোনও পাহারাদার বসে আছে বোঝা যায়। পুরো এলাকাটা কিন্তু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা নয়, হয়তো এক সময় ছিল, এখন ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে গেছে।

কাকাবাবু আর সন্তু বাড়িটার চারপাশ ঘুরে দেখল। ভেতরে কোনও মানুষজন আছে কিনা বোঝাই যায় না। টোবি দত্ত বিদেশ থেকে একা ফিরে এসেছে, তার বউ-ছেলেমেয়ে আছে কিনা তা জানে না কেউ। একটা পোষা কুকুর ছিল, সেটাও তো মরে গেল!

সবদিক দেখে কাকাবাবু নদীর ধারেই বসলেন। আকাশ বেশ মেঘলা, আজ আর চাঁদ ওঠার আশা নেই। অন্ধকারে প্রায় কিছুই দেখা যায় না, তবু নদীর ধারে বসলে ভাল লাগে।

সন্তু পকেট থেকে একটা ছোট্ট ক্যামেরা বের করল।

কাকাবাবু বললেন, "এই অন্ধকারে ক্যামেরা দিয়ে কী করবি?"

সন্তু বলল, "যদি ইউ এফ ও আসে, ছবি তুলব। ছবি তুলতে পারলে জোজো আমাকে একটা দারুণ জিনিস খাওয়াবে বলেছে!"

"কী খাওয়াবে!"

"সেটা একটা নতুন কিছু জিনিস, আমি নাম ভুলে গেছি।"

"জোজোকে এবার সঙ্গে নিয়ে এলি না কেন? ও থাকলে বেশ মজার-মজার কথা শোনা যায়।"

"তুমি তো তখন জোজোকে সঙ্গে নেওয়ার কথা বললে না! তা ছাড়া ওকে নাকি জাপানের সম্রাট নেমন্তন্ন করেছে।"

"তা হলে আর আসবে কেন বল! কোথায় জাপানের রাজবাড়িতে ভোজ খাওয়া আর কোথায় কোচবিহারের পাড়াগাঁয়ে রাত্তিরবেলা বসে মশার কামড় খাওয়া!"

"কাকাবাবু, একটা কিসের শব্দ হচ্ছে।"

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। একটা বড় গোছের ডায়নামো বা জেনারেটর চালু হওয়ার মতন শব্দ আসছে টোবি দত্তের বাড়ির ভেতর থেকে। শব্দটা ক্রমে বাড়তে লাগল, তারপর ফট করে জ্বলে উঠল আলো।

বাড়ির অন্য কোথাও আলো নেই, শুধু ছাদ থেকে একটা আলোর শিখা উঠে গেল আকাশের দিকে। ফ্লাড লাইটের মতন ছড়ানো আলো নয়, একটাই শিখা। ভারী সুন্দর দেখতে আলোটা, গাঢ় নীল রং, দারুণ তেজী আলো, মেঘ ফুঁড়ে চলে গেছে মনে হয়।

সেইদিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "এটা যদি ওর শখের ব্যাপার হয়, তা হলে অদ্ভুত শখ বলতেই হবে! মাঝরাতে রোজ এরকম একটা আলো জ্বালিয়ে রাখার মানে কী?"

সন্তু বলল, "নিশ্চয়ই অন্য কাউকে কিছু সঙ্কেত জানাতে চায়।"

কাকাবাবু বললেন, "প্রত্যেকদিন আলো জ্বেলে কী সঙ্কেত পাঠাবে?"

সন্তু বলল, "অন্য কেউ যাতে সন্দেহ না করে, সেইজন্য রোজই আলো জ্বালিয়ে দেয়।"

প্রায় আধ ঘণ্টা ওরা তাকিয়ে রইল। আলোটা সমানভাবে জ্বলতেই লাগল। আর কিছুই ঘটছে না।

কাকাবাবু এক সময় বললেন, "আলোটা তো দেখা হল, চল আর বসে থেকে লাভ কী? এরকম একটা জোরালো আলো তৈরি করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়!"

সন্তু বলল, "এ-গ্রামের লোকজন মাঝরাত্তিরে আলোটা দেখে

বাড়িতে তো কুকুর নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "যাঃ, পাগল নাকি? নাঃ, ওসব দরকার নেই। ফিরে গিয়ে এখন ঘুমনো যাক। কাল সকালে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা যাবে!"

নদীর ধার ছেড়ে ওরা উঠে এল রাস্তার দিকে। টোবি দত্তর বাড়িটা ডানপাশে। এখন সেটা আগের মতনই অন্ধকার। কোনও সাড়াশব্দ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "অন্যের মুখে শোনা আর নিজের চোখে দেখায় কত তফাত বুঝলি? সবাই বলেছে, আলোটা সোজা আকাশের দিকে উঠে যায়। তারপর যে আলোটা বেঁকে অনেকক্ষণ জঙ্গলের মধ্যে থাকে, সেটা কেউ বলেনি।"

সন্তু এ-ব্যাপারটায় তেমন গুরুত্ব দিল না। সে আগুনের পাখির মতন বায়ুযানটার কথাই ভাবছে।

কাকাবাবু আবার আপনমনে বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে ওরকম আলো ফেলার মানে কী?"

সন্তু বলল, "আকাশ দিয়ে আগুন ছড়াতে-ছড়াতে অত শব্দ করে জিনিসটা উড়ে এল, তবু গ্রামের কোনও লোক জাগেনি?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ-কেউ নিশ্চয়ই জেগে উঠে দেখেছে। ভয়ে বেরোয়নি বাড়ি থেকে।"

সন্তু কাকাবাবুর গা ঘেঁষে এসে বলল, "কাকাবাবু, আমার খুব ইচ্ছে করছে ওই বাড়ির ছাদটা একবার দেখে আসতে। আমার দৃঢ় ধারণা, ওখানে অন্য গ্রহের কোনও প্রাণী আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "দুর, যতসব উদ্ভট ধারণা!"

"তবু একবার দেখে আসি না!"

"তুই ছাদে উঠবি কী করে?"

"বাড়ির বাইরের দেওয়ালে মোটা-মোটা জলের পাইপ আছে। সেই একটা পাইপ বেয়ে উঠে যাব।"

"তারপর ধরা পড়ে গেলে?"

"ধরা পড়ব কেন? এখন সব শুনশান হয়ে গেছে। এ বাড়িতে বেশি লোক নেই তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কুকুরও নেই। আমি টপ করে দেখে চলে আসব।"

"কী যে বলিস, সন্তু! হঠাৎ যদি ধরা পড়িস—আমি তোকে উদ্ধার করব কী করে? আমি তো আর পাইপ বেয়ে উঠতে পারব না!"

"আমাকে ধরে রাখলে তো সুবিধেই হবে। তুমি পুলিশ ডেকে তখন জোর করে ওর বাড়িতে ঢুকতে পারবে।"

"তবু আমার ভাল লাগছে না রে, সন্তু?"

"তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি খুব সাবধানে যাব। যদি একটা দারুণ কিছু আবিষ্কার করে ফেলতে পারি?"

টোবি দত্তর বাড়ির পেছন দিকে দু'জনে আগে খানিকটা ঘোরাঘুরি করে দেখে নিলেন। এদিকে কোনও পাহারাদার নেই। কাকাবাবু দু-একবার টর্চ জ্বালালেন নিচু করে, তাতেও কিছু হল না।

সত্যিই দুটো জলের পাইপ রয়েছে দেওয়ালে। পুরনো আমলের মোটা-মোটা পাইপ। সন্তু নিজের ক্যামেরাটা কাকাবাবুকে রাখতে দিয়ে নিজে একটা টর্চ পকেটে রাখল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুই এই পাইপ বেয়ে উঠতে পারবি?"

সন্তু পাইপটার গায়ে একটা চাঁটি মেরে বলল "ইজি! নাইজিরিয়াতে এর চেয়েও শক্ত আর অনেক উঁচুতে পাইপ বেয়ে কতবার উঠেছি!"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে তাকাতেই সন্তু বলল, "এটা আমার কথা

নয়। হঠাৎ মনে হল, জোজো এখানে থাকলে এইরকম কথাই বলত।"

এত উদ্বেগের মধ্যেও কাকাবাবুর মুখে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। সন্তু যে এখনও ইয়ার্কি করতে পারছে, তার মানে ওর মনে ভয় ঢোকেনি। ছেলেমানুষ তো, ইউ এফ ও আবিষ্কার করার উত্তেজনায় ছটফট করছে।

কাকাবাবু বললেন, "দশ মিনিটের বেশি কিছুতেই থাকবি না।"

সন্তু জুতো খুলে পাইপটা জড়িয়ে ধরে উঠতে শুরু করল। কাকাবাবু এখনও ভাবছেন, কাজটা হঠকারিতার মতন হয়ে গেল কিনা! দুঃসাহস আর হঠকারিতা এক নয়। টৌবি দত্ত অভদ্র, রুক্ষ, নিষ্ঠুর ধরনের লোক। সন্তুকে ধরে ফেলে যদি অত্যাচার করে!

সন্তু আস্তে-আস্তে উঠতে লাগল। মরচে-ধরা পাইপ বলেই পিছলে যাচ্ছে না হাত। মাঝে-মাঝে আংটা আছে, পা রাখা যায়। একতলা পেরিয়ে দোতলায় উঠে গেল সে। এক জায়গায় পাশে একটা জানলা পড়ল, সেটা ভেতর থেকে বন্ধ। দোতলায় কার্নিসে এসে একটুক্ষণ থেমে-থেমে শব্দ শুনবার চেষ্টা করল। তারপর শোনা গেল একটা বাচ্চা ছেলের গলায়, আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!

কে যেন কী হুকুম করলো তাকে।

বাচ্চার গলাটা আবার বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!"

এ-বাড়িতে কোনও বাচ্চা ছেলে আছে, তা তো কেউ আগে বলেনি!

এর পর একটা গম্ভীর মোটা গলা বলল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!"

যেন একজন কেউ একটা বাচ্চাকে কথা বলা শেখাচ্ছে। সন্তুর

মনটা আনন্দে নেচে উঠল। ই টি? অন্য গ্রহের শিশু?

এবার সন্তু আস্তে মাথা তুলল। কেউ নেই। প্রথমে একটা ছোট ছাদ। তারপর একটা পাঁচিলের ওপর আবার ছোট ছাদ। বড় বাড়ি হলেও ছাদগুলো খোপ-খোপ করা। একপাশে একটা ঘর, কথা শোনা যাচ্ছে সেখান থেকেই।

সন্তু একটা পাঁচিল ডিঙিয়ে এল। পরের ছাদটায় একটা কোনও বড় যন্ত্র ঢাকা দেওয়া আছে। ওইটাই নিশ্চয়ই আলোর ব্যাপার। আরও কয়েকটা কাঠের বাক্স এদিক-ওদিক ছড়ানো।

দ্বিতীয় পাঁচিলটা ডিঙোতে যেতেই কয়েকটা খুব সরু-সরু তারে তার পা লেগে গেল। পাঁচিলের নীচের দিকে এই তারগুলো টান-টান করে বাঁধা আছে। ইলেকট্রিক তার নয়। সেতারের তারের মতন। মৃদু ঝন্‌ন করে শব্দ হল। সন্তু চট করে সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁড়াল আর-একটা পাঁচিলের পাশে। দাঁড়িয়ে রইল কাঠ হয়ে।

খুট করে শব্দ হয়ে জ্বলে উঠল একটা মিটমিটে আলো। খুলে গেল ঘরের দরজা। তারপর সন্তু যা দেখল, তাতে তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল, যেন তার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে!

দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কঙ্কাল। সাদা হাড় আর মাথার খুলি, চোখ দুটোর জায়গায় সবুজ আলো জ্বলছে।

সন্তু ভাবল, "এ আমি কী দেখছি? ভূত? কিন্তু ভূত বলে তো কিছু নেই। আমি ভূত বিশ্বাস করি না। তবে কি চোখের ভুল!"

সন্তু চোখ কচলে নিল। না। একটা সত্যিকারের কঙ্কাল এগিয়ে আসছে তার দিকে।

সন্তু তবু জোর দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছে, না, না, হতেই পারে না। মানুষের শুধু কঙ্কাল হাঁটবে কী করে? কঙ্কালের তো প্রাণ

অনির্বাণ বলল, "হ্যাঁ, চলুন সেখানেই যাই।"

খাওয়া শেষ করে ডাক্তার-দম্পতিকে ধন্যবাদ জানিয়ে কাকাবাবুরা আবার গাড়িতে চাপলেন।

যেতে-যেতে অনির্বাণ বলল, "কাকাবাবু, কলকাতায় ফোন করে আমি টোবি দত্ত সম্পর্কে অনেক খবর জোগাড় করেছি। ওর ভাল নাম তরুবর দত্ত। কিন্তু সবাই টোবি দত্ত নামেই জানে। পাসপোর্টেও ওই নামই আছে। টোবি দত্ত অল্প বয়েসে এক পাদ্রির সঙ্গে জার্মানি চলে যায়। সেখানে লেখাপড়া শিখে ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার হয়। সেখানে কিছুদিন চাকরি করে চলে যায় জাপানে। জাপানে একটা বড় কারখানায় কাজ করত। গত বছর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে কাজ ছেড়ে দেয়। কয়েক মাস জাপানেরই এক হাসপাতালে ছিল। তারপর অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে ফিরে এসেছে দেশে। সঙ্গে নানারকম যন্ত্রপাতিও এনেছিল। এয়ারপোর্টের কাস্টমসের খাতায় তার রেকর্ড আছে। আমাদের পুলিশের খাতায় ওর নামে কোনও অভিযোগ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "জানা গেল যে, লোকটি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ার। জাপানিদের কাছে পাত্তা পাওয়া সহজ কথা নয়! যে-যন্ত্রপাতি এনেছে, তা দিয়ে ওরকম আলো তৈরি করতে পারে। আর একটুখানি খবর নিতে পারবে? জাপানে ওর কী অসুখ করেছিল আর কোন হাসপাতালে ছিল?"

অনির্বাণ বলল, "জানবার চেষ্টা করব।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "সুশীল গোপ্পী কোথায় থাকে?"

অনির্বাণ বলল, "সুশীল গোপ্পী কে?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তুমিই তো তার নাম বলেছিলে। টোবি দত্তর সঙ্গে দিনহাটায় এক স্কুলে, এক ক্লাসে পড়ত। যাকে

দেখে টোবি দত্ত চিনতে পারেনি। তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই।"

অনির্বাণ বলল, "সে বোধ হয় এখন কোচবিহার শহরেই থাকে। আমার ডি· এস· পি-কে বলে তাকে খুঁজে বের করছি।"

মণিকা বলল, "ওই টোবি দত্ত আমাদের গ্রামের কোনও লোকের সঙ্গে মেশে না। বাবা একদিন স্কুলের একটা ফাংশানে নেমন্তন্ন করেছিলেন, তাও আসেনি। তবে স্কুলের ফান্ডে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে!"

অনির্বাণ বলল, "টোবি দত্ত কারও সঙ্গে মেশে না, ওর কোনও বন্ধু নেই। মাস দু-এক আগে একটা হাট থেকে ফিরছিল টোবি দত্ত, এই সময় সন্ধের অন্ধকারে দু-তিনটে লোক ওকে ঘিরে ফেলে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল। ছুরি মেরেছিল ওর পিঠে। খুব বেশি আহত হয়নি। টোবি দত্ত পালিয়ে গিয়েছিল কোনওরকমে। তারপর থেকে টোবি দত্ত আর একলা-একলা কোথাও যায় না। ওর একটা বড় স্টেশন ওয়াগন গাড়ি আছে, সেটা নিয়ে মাঝে-মাঝে বেরোয়।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে গুণ্ডারা মারতে গিয়েছিল, সেজন্য ও পুলিশের সাহায্য চায়নি?"

অনির্বাণ বলল, "পিঠে ছুরি-বেঁধা অবস্থায় টোবি দত্ত রাস্তা দিয়ে দৌড়চ্ছে, সেই অবস্থায় ওকে হাট থেকে ফেরা অনেক মানুষ দেখতে পায়। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। পুলিশেরও কানে আসে। ওখানকার থানার ও. সি. নিজেই টোবি দত্ত-র কাছে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। তাকে ভাগিয়ে দিয়ে টোবি দত্ত বলেছে, 'যান, যান, আপনারা পুলিশ কিচ্ছু করতে পারবেন না!'"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের ওপর ওর রাগ আছে দেখা যাচ্ছে। সেইজন্য তোমার সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেছিল। কাল

থাকে না! তবু ওটা হেঁটে আসছে, ধপ-ধপ আর ঝন-ঝন শব্দ হচ্ছে।

সন্তু এমনই স্তম্ভিত হয়ে গেছে যে, তার পা যেন গেঁথে গেছে মাটির সঙ্গে। সে পালাতেও পারছে না। সে প্রাণপণে বলবার চেষ্টা করছে, এটা চোখের ভুল, ভূত নেই, ভূত নেই, কঙ্কাল হাঁটতে পারে না, পারে না!

কঙ্কালটা কাছে এসে পড়ে দু' হাত দিয়ে সন্তুর কাঁধ চেপে ধরে শূন্যে তুলল। অসম্ভব শক্ত আর ঠাণ্ডা তার হাত। সন্তু নড়তে-চড়তে পারছে না। কঙ্কালটা এইবার তাকে ছুড়ে ফেলে দেবে।

ঠিক তক্ষুনি গম্ভীর মোটা গলায় কেউ ডাকল, "রোবিন! রোবিন!"

কঙ্কালটা অমনই একটা বাচ্চা ছেলের গলায় বলে উঠল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!"

দরজার সামনে এখন এসে দাঁড়িয়েছে একজন লম্বাচওড়া মানুষ। কঙ্কালটা থপথপিয়ে এসে সন্তুকে নামিয়ে দিল সেই লোকটির সামনে।

সন্তু লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে আরও কেঁপে উঠল। এ কী দেখছে সে? লোকটির মোটে একটা চোখ, অন্য চোখটার জায়গায় শুধু একটা অন্ধকার গর্ত!

লোকটি কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী চাই এখানে?"

লোকটির মুখ দেখে চিনতে পারেনি সন্তু। চোখের গড়ন দেখেই মানুষকে চেনা যায়। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে বুঝল, এই-ই টোবি দত্ত। কিন্তু সকালবেলা নদীর ধারে সে দেখেছিল টোবি দত্তকে, তখন তার দুটো চোখই ঠিকঠাক ছিল, এখন একটা চোখ একেবারে অদৃশ্য। অন্য চোখটা জ্বলছে। তা হলে কি

টোবি দত্তও মানুষ নয়? অন্য গ্রহের প্রাণী? এদের আসল রূপ এমন বীভৎস?

সন্তু আর চিন্তা করতে পারল না। তার পেছনে একটি জীবন্ত কঙ্কাল, সামনে একটি একচক্ষু দৈত্য। তার বুক চিরে একটা আর্তনাদ বেরিয়ে এল। সে আ-আ-আ শব্দ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কাকাবাবু সন্তুর আর্তনাদ শুনতে পেলেন না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পাইপের নীচে। তাঁর রেডিয়াম দেওয়া ঘড়ি অন্ধকারেও দেখা যায়। ঘনঘন ঘড়ি দেখছেন। সন্তু ওপরে ওঠার পর এখনও দশ মিনিট কাটেনি।

হঠাৎ পেছনে খড়মড় শব্দ হতেই তিনি রিভলভার নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। প্রথমে কিছু চোখে পড়ল না। টর্চ জ্বালাতেই দেখলেন, একটা ঝোপের পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে মণিকা। তার মুখে দুষ্টুমির হাসি।

কাকাবাবু দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "এ কী, তুমি এখানে?"

মণিকা তার উত্তর না দিয়ে বলল, "সন্তুর কী হল? নিশ্চয়ই ধরা পড়ে গেছে।"

কাকাবাবু বিরক্তভাবে বললেন, "তোমাকে বাড়িতে যেতে বলেছি, তুমি এতক্ষণ বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছ?"

মণিকা বলল, "বাড়ি গিয়েছিলাম তো! আগুন-পাখিটা যখন এল, সেই আওয়াজে আবার ঘুম ভেঙে গেল। বাড়িতে আমার ভয় করছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারে একা-একা ঘুরে বেড়াতে বুঝি ভয় করে না!"

মণিকা বলল, "একা তো ঘুরিনি। তোমাদের কাছাকাছিই ছিলাম। কিন্তু সন্তু ফিরছে না কেন? ধরা পড়ে গেছে। ও

চেঁচিয়ে বলল, শুনতে পাওনি !"

কাকাবাবু বললেন, "না তো !"

মণিকা বলল, "আমি গিয়ে দেখে আসছি !"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কোথায় যাবে ?"

মণিকা বলল, "ছাদে ! আমিও পাইপ বেয়ে উঠতে পারব। আমি ছাদে চড়তে জানি !"

কাকাবাবু বললেন, "পাগলের মতন কথা বোলো না। তুমি পাইপ বেয়ে উঠবে ?"

মণিকা বলল, "মেয়ে বলে বুঝি পারব না ? দেখো না !"

সত্যিই সে পাইপ বেয়ে ওঠার চেষ্টা করল। এ যে আর-এক ঝামেলা ! সে কাকাবাবুর নিষেধ শুনবে না কিছুতেই। কাকাবাবু দৃঢ়ভাবে তার কাঁধ ধরে এক হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে এনে বললেন, "শোনো, তোমাকে আরও শক্ত একটা কাজ করতে হবে !"

মণিকা বলল, "কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা দু'জন দরকার হলে দরজা ভেঙে এই বাড়ির মধ্যে ঢুকব ! কিন্তু তার আগে একটা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। সামনের লোহার গেটের কাছে গুমটির মধ্যে একজন পাহারাদার বসে আছে। তুমি তাকে গুমটির বাইরে ডেকে আনতে পারবে ?"

মণিকা বলল, "ওর হাতে বন্দুক থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "বন্দুক থাকলে কী হয়েছে ! তোমার মতন একটা মেয়েকে দেখামাত্র গুলি করবে নাকি ? সে ভয় নেই। তুমি ওর গুমটির সামনে গিয়ে কাঁদতে শুরু করো। কাঁদতে-কাঁদতে বলবে যে, তোমাদের বাড়িতে চোর এসেছে, ওর সাহায্য চাইতে এসেছ।"

মণিকা বলল, "যদি তবুও না বেরোয় ?"

কাকাবাবু বললেন, "যা হোক বানিয়ে বলবে। চোরেরা তোমাকে মেরেছে, পা দিয়ে রক্ত পড়ছে ! কোনওক্রমে ওকে বের করা চাই ! যাও, ছুটে যাও !"

কাকাবাবু আর-একবার পাইপের ওপর দিকটা দেখলেন। সন্তুর কোনও চিহ্ন নেই। সন্তু ধরাই পড়ে গেছে তা হলে।

তিনিও দ্রুত এগিয়ে গেলেন গুমটির দিকে।

মণিকা বেশ ভালই অভিনয় করতে পারে। সে কেঁদে-কেঁদে বলছে, "ওগো, আমাদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ! সব নিয়ে গেল। আমার বাবাকে বেঁধে রেখেছে।"

গুমটির পাহারাদারটি ভেতর থেকেই কথা বলছে। বাইরে আসবার লক্ষণ নেই।

মণিকা মাটিতে বসে পড়ে বলল, "আমার পায়ে রামদা দিয়ে কোপ মেরেছে।"

লোকটি বলল, "আমার যে এখান থেকে কোথাও যাওয়ার হুকুম নেই। দেখি, পায়ে কতখানি লেগেছে ?"

লোকটি বেরিয়ে আসতেই আড়াল থেকে এসে কাকাবাবু রিভলভার ঠেকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, "বন্দুকটা ফেলে দাও ! নইলে তোমার মাথার খুলি উড়ে যাবে।"

লোকটি বন্দুকটা ফেলে দিয়ে বলল, "এখানেও ডাকাত ?"

কাকাবাবু বললেন, "বাড়ির কাছে চলো। দরজা খুলতে হবে।"

লোকটি বলল, "দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আমি খুলব কী করে ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়ির মধ্যে ক'জন লোক আছে ?"

লোকটি বলল, "তিন-চারজন হবে। আমি তো ভেতরে যাই

কাকাবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে সে জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোনদিকে যাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "একটু দাঁড়াও। আগে ব্যাপারটা একটু বুঝে নিতে হবে।"

এবার তিনি টোবি দত্তর বাড়ির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। আবছা অন্ধকারে বাড়িটাকে জনমনুষ্যহীন মনে হয়।

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তর বাড়ির ছাদে গভীর রাতে একটা জোরালো আলো জ্বলে। কেন সে আলোটা জ্বালে, এর একটা সহজ উত্তর আমাদের মনে আসেনি।"

অনির্বাণ বলল, "কাকাবাবু, আপনার কাছে উত্তরটা সহজ মনে হতে পারে, আমাদের কাছে কিন্তু খুবই জটিল।"

কাকাবাবু বললেন, "জটিল কেন হবে ? আলোটা সে জ্বালে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।"

অনির্বাণ বলল, "হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু কার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার !"

অনির্বাণ চমকে গিয়ে খানিকটা অবিশ্বাসের সুরে বলল, "আমার জন্য ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তোমার মতন পুলিশের বড়কর্তাদের জন্য ! সে গোপনে কিছু করতে চাইলে নিশ্চয়ই এরকম একটা তেজি আলো জ্বালাত না। এই আলো তো লোকের নজরে পড়বেই। সে জানান দিতে চায়, আমি এরকম একটা আলো জ্বেলেছি, তোমরা এসে দ্যাখো !"

"আমরা এসে কী দেখব ?"

"তুমি পুলিশের বড়কর্তা। মন্ত্রীদের আর ভি আই পি-দের দেখাশোনা করতেই তোমাদের সময় কেটে যায়। তুমি ব্যস্ত

লোক, নিজে এসে দেখতে পারোনি। তোমার স্পাইদের মুখে খবর পেয়েছ। তারা তোমাকে ঠিক খবর দেয়নি।"

"এখানকার থানার দারোগাও রিপোর্ট করেছে এই অদ্ভুত আলোর কথা।"

"সেটাও ভুল রিপোর্ট।"

"কেন, ভুল বলছেন কেন ?"

"হয় তোমার স্পাই কিংবা দারোগা ভাল করে দেখেনি। অথবা ইচ্ছে করে ভুল খবর দিয়েছে। এসে থেকে শুনছি, আলোটা আকাশের দিকে জ্বলে, মেঘ ফুঁড়ে যায়। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম, আলোটা আকাশের দিকে কিছুক্ষণ জ্বলে বটে, তারপর বেঁকে যায়। এই জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়ে, আর অনেকক্ষণ থাকে। অর্থাৎ টোবি দত্ত প্রথমে ওপরের দিকে আলো ফেলে যেন বলতে চায়, এই যে দ্যাখো আমার শক্তিশালী আলো। এবার সেই আলো আমি জঙ্গলে ফেলছি।"

"জঙ্গলে কী আছে ?"

"সেটাই তো এখন আমরা দেখতে যাব। এরকম একটা সঙ্কেত সে দিয়ে যাচ্ছে, কেউ গ্রাহ্য করেনি। এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়ার জন্য ইউ এফ ও-টিউ এফ ও'র ধাপ্পা দেওয়া হয়েছে। খবরের কাগজে, রেডিয়োতে ইউ এফ ও নিয়েই গালগল্প ফাঁদা হয়েছে, এই আলোটার কথা কেউ বিশেষ পাত্তাই দেয়নি !"

"ইউ এফ ও'র ধাপ্পা কে দিয়েছে ? আমরা তো দিইনি ! পুলিশ থেকে আমরা জানিয়েছি যে কর্নেল সমর চৌধুরীর হেলিকপ্টার গেছে ওখানে !"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আর সন্তু মনে-মনে বিশ্বাস করে ফেলেছ যে, আর-একটা কোনও উড়ন্ত চাকিও ওখানে আসে ! কিন্তু গ্রামের

না।"

দরজার কাছে এসে কাকাবাবু বললেন, "লাথি মারো। ভেতরের লোকজনদের ডাকো!"

লোকটি বেশ অবাক হয়ে বলল, "দলে আর কেউ নেই? আপনি একা, মানে বগলে লাঠি নিয়ে যেতে চান!"

কাকাবাবু ধমক দিয়ে বললেন, "ডাকো!"

মণিকা দমাদম সেই দরজায় লাথি মারতে লাগল।

কাকাবাবু চিৎকার করে ডাকলেন, "টোবি দত্ত, টোবি দত্ত! দরজা খোলো! আমি রাজা রায়চৌধুরী।"

কয়েকবার ডেকেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "মণিকা, পাহারাদারের রাইফেলটা কুড়িয়ে নিয়ে এসো তো! গুলি করে আমি দরজা ভেঙে ফেলব।"

মণিকা রাইফেলটা নিয়ে আসার আগেই দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। হাতে একটা হ্যাজাক বাতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে টোবি দত্ত। স্থির দু' চোখে কটমট করে তাকাল কাকাবাবুর দিকে।

কাকাবাবুর রিভলভারটা তখনও পাহারাদারের ঘাড়ে ঠেকানো। এক ঝটকায় পাহারাদারকে সরিয়ে দিয়ে টোবি দত্তর দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বললেন, "সন্তু কোথায়? সন্তুর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তোমাকে আমি চরম শাস্তি দেব। এই বাড়িটা গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেব!"

টোবি দত্ত কাকাবাবুর রিভলভার কিংবা ভয়-দেখানো কথা গ্রাহ্যই করল না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, "অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন কেন? মাইন্ড ইওর ওন বিজনেস।"

তারপর মাথাটা পেছন দিকে ফিরিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আবার বলল, "ছেদিলাল, ছেলেটাকে বাইরে শুইয়ে দে। ওর কিছু হয়নি, নিজেই ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

টোবি দত্তর পেছনে দাঁড়িয়ে একজন বেঁটে গাট্টাগোট্টা লোক। সে দু' হাতে পাঁজাকোলা করে ধরে আছে সন্তুকে। আস্তে-আস্তে সে সন্তুকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

তারপরেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

পরদিন সকালে প্রথম কাজই হল সন্তুকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া।

সন্তুর অবশ্য একটু পরেই জ্ঞান ফিরে এসেছিল। টোবি দত্তর বাড়ির সামনে থেকে সে হেঁটেই ফিরেছে। ওই বাড়ির ছাদে কী-কী ঘটেছিল, তাও কাকাবাবুকে শুনিয়েছে। কাকাবাবু কোনও মন্তব্য করেননি। শুধু একবার বলেছিলেন, "ঠিক আছে, এসব পরে দেখা যাবে!"

অনির্বাণের গাড়িটা রয়েছে বলে সুবিধে হয়ে গেল। সকালবেলা শুধু এককাপ চা খেয়েই কাকাবাবু বেরিয়ে পড়তে চাইলেন, মণিকাও ঝোলাঝুলি করতে লাগল সঙ্গে যাওয়ার জন্য। হেডমাস্টারমশাই বাধ্য হলেন মত দিতে।

কাকাবাবু সামনে আর মণিকা-সন্তু পেছনে। সন্তু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গুম হয়ে আছে। কাল রাত্তিরের ঘটনাগুলো সে কিছুতেই মেলাতে পারছে না। কাকাবাবু বললেন, তিনি টোবি দত্তর দুটো চোখই দেখেছেন। অথচ একটু আগে সন্তু দেখেছে তার একটামাত্র চোখ, সেটা ধকধক করে যেন জ্বলছিল, অন্য চোখটার জায়গায় শুধু একটা গর্ত। বীভৎস মুখখানা। সেটা

সন্তুর চোখের ভুল ? এরকম ভুল তো তার আগে কখনও হয়নি ? আর ওই কঙ্কালের ব্যাপারটা তার নিজেরই এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। অথচ সত্যিই তো সে দেখেছিল ! কেন অত তাড়াতাড়ি সে অজ্ঞান হয়ে গেল ? না হলে সে রহস্যটা ঠিকই ধরে ফেলত।

বনবাজিতপুর ছাড়াবার পর মণিকা বলল, "দ্যাখো দ্যাখো সন্তু, ওই পুকুরটায় কত শাপলা ফুটে আছে। আমরা এটাকে বলি শাপলা পুকুর।"

সন্তু মুখটা ফিরিয়ে বেশ জোরে-জোরে ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠল।

মণিকা শিউরে উঠে খানিকটা সরে গিয়ে বলল, "এ কী ! এ কী !"

কাকাবাবুও পেছন ফিরে তাকিয়েছেন।

সন্তু বলল, "তুমি তো দেখতে চাইছিলে আমার জলাতঙ্ক রোগ হয়েছে কিনা ? হ্যাঁ, হয়েছে, ঘেউ-ঘেউ-ঘেউ !"

কাকাবাবু বললেন, "এই সন্তু, মেয়েটাকে ভয় দেখাচ্ছিস কেন ?"

মণিকা বলল, "আমি মোটেই ভয় পাইনি। পোষা কুকুর অমন বিচ্ছিরিভাবে ডাকে না। এইরকম ডাকে, ভুক-ভুক, ভুক-ভুক, ভুক।"

সন্তু বলল, "পোষা কুকুর পাগল হয়ে গেলেও বুঝি ওরকম মিষ্টি সুর করে ডাকবে ?"

গাড়ির ড্রাইভার বলল, "আমি একবার একটা পাগলা কুকুরের ডাক শুনেছিলাম, এইরকম, ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা, ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা !"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়িটা যে কুকুরের খাঁচা হয়ে গেল ! তার চেয়ে বরং সেই হেমো দুধওলার গান গাওয়া যাক। তুমি জানো,

মণিকা ?"

মণিকা বলল, "না।"

কাকাবাবু নিজেই গেয়ে শোনাতে লাগলেন, "হেমো গয়লার ছিল যে এক গাঁয়ের বাড়ি/ সেথায় ছিল মস্ত বড় একটা হাঁসের ঝাঁক/ হেথায় প্যাঁক, হোথায় প্যাঁক, চারদিকেতে প্যাঁক প্যাঁক/ হেমো গয়লার ছিল যে এক..."

সন্তু জানলেও এই গানে গলা মেলাল না। তার মন ভাল নেই।

ডাক্তারের বাড়িতে এসে কিছু ভাল খবর পাওয়া গেল।

শৈবাল দাশগুপ্ত সন্তুর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, "নো প্রব্লেম। কুকুরটার মাথা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সে পাগল ছিল না। তবে কেউ তাকে বিষ খাইয়েছিল ঠিকই। সেই বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে সে কিছুক্ষণ পরেই মারা যেত। হয়তো তোমার মতন চেহারার কোনও ছেলে ওকে বিষ খাইয়েছে, সেইজন্য হঠাৎ তোমাকে কামড়াতে এসেছিল।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তা হলে সন্তুকে আর অত ইঞ্জেকশন নিতে হবে না ?"

শৈবাল দাশগুপ্ত বললেন, "নাঃ, কোনও দরকার নেই।"

মালবিকা বললেন, "কাল আপনারা আমার বাড়িতে কিছুই খাননি। আজ কিন্তু ব্রেকফাস্ট খেতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও আপত্তি নেই। কী রে সন্তু, এখনও মুখ গোমড়া করে আছিস কেন ?"

মালবিকা বললেন, "নিশ্চয়ই ওর খিদে পেয়ে গেছে।"

শৈবাল দাশগুপ্ত বললেন, "অনির্বাণ ফোন করেছিল, সেও এসে যাবে একটু পরেই। কালকের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে পুলিশ মহলে সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গেছে। লোকটার বয়েস বছর-চল্লিশেক,

টোবি দত্ত বলল, ওর কুকুরকে কেউ বিষ খাইয়েছে। তার মানে ওর একটা শত্রুপক্ষ আছে।"

অনির্বাণ বলল, "সবাই জানে ওর অনেক টাকা-পয়সা আছে। তা ছাড়া ওর ব্যবহারটা খুবই রুক্ষ, সুতরাং ওর শত্রু তো থাকতেই পারে। মুশকিল হচ্ছে, লোকটা যে আমাদের সঙ্গে দেখাই করতে চায় না!"

গাড়ি এবার কর্নেল সমর চৌধুরীর বাংলোর কম্পাউন্ডে ঢুকল। কর্নেল চৌধুরী তখন বাগানে ঘোড়ায় ঘুরছেন। আর কয়েকজন অফিসার পায়ে হেঁটে তাঁর সঙ্গে যেতে-যেতে কথা বলছে। কাকাবাবুদের দেখে তিনি ইঙ্গিতে ভেতরে গিয়ে বসতে বললেন।

একটু পরে তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা শেষ করে বারান্দার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামলেন। তাঁর অঙ্গে পুরোপুরি সামরিক পোশাক। মাথায় টুপি।

কর্নেল চৌধুরী কাছে এসে বললেন, "এই মিষ্টি মেয়েটি কে?"

তারপর সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার তো আর কোনও প্রব্‌লেম নেই শুনলাম। গুড নিউজ!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কর্নেল চৌধুরী, আপনি কাল রাত্তিরে হেলিকপ্টার নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন?"

কর্নেল চৌধুরী খুবই অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "আমি তো কাল রাতে কোথাও বেরোইনি। ওখানে মানে কোথায়?"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্ত-র বাড়ির ওদিকটায়?"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "ওখানে আর শুধু-শুধু যাব কেন? আপনাদের তো কালই বললাম, ওখানে গিয়ে আর কোনও লাভ নেই। না, না, না, কাল কোনও হেলিকপ্টার ওড়েনি।"

তিনি গলা চড়িয়ে ডাকলেন, "সেলিম! সেলিম!"

পাশের ঘর থেকে একজন সুদর্শন যুবক দরজার কাছে স্যালুট দিল।

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট সেলিম চৌধুরী। কোনও হেলিকপটার উড়লে সেলিম জানবে, লগ বুকে এন্ট্রি থাকবে। সেলিম, কাল কোনও হেলিকপটার উড়েছিল ?"

সেলিম বলল, "না সার !"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "হেলিকপটার নিয়ে তো আমি একা আকাশে উড়ি না। সেলিমও সঙ্গে থাকে। গ্রামের লোক বুঝি কালও একটা দেখেছে ? ওদের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "কাল যে ওখানে একটা হেলিকপটার সত্যিই এসেছিল তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখেছি।"

কর্নেল চৌধুরী তবু বললেন, "তা কী করে হয় ! এখানে আর কারও কাছে হেলিকপটার নেই, থাকা সম্ভবও নয়।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু আমরা তিনজনেই তো ভুল দেখিনি।"

মণিকা বলল, "ওইটার শব্দ শুনেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।"

সন্তু বলল, "গ্রামের লোক ভুল বলে না। ওটা থেকে আগুন ছড়াচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আগুন তো তৈরি করা যায়। তুবড়ি, রংমশাল থেকে যেরকম আগুনের ফুলকি বেরোয়, অনেকটা সেইরকমই মনে হল।"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "এটা তো খুব চিন্তার বিষয় হল ! অন্য একটা হেলিকপটার আসে ? কোথা থেকে আসে ? তবে কি

ইউ এফ ও হতে পারে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা তো গ্রামের লোকের কথায় পাত্তা দেন না। তারা তো আগেই বলেছে যে, একটা আগুনের পাখি পাঁচ-ছ'বার এসেছে।"

কর্নেল চৌধুরী অনির্বাণের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা কোনও কম্মের না ! ওই টোবি দত্তকে এখনও অ্যারেস্ট করতে পারলেন না ? ওকে ধরে পেটে কয়েকটা গুঁতো মারলেই সব কথা জানা যেত।"

অনির্বাণ বলল, "ওকে অ্যারেস্ট করার কোনও কারণ যে এখনও খুঁজে পাচ্ছি না !"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "পুলিশকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আমি অ্যাকশান নিতে হবে। আমি দিল্লিতে খবর পাঠিয়েছি। বাড়ির ছাদে ওরকম একটা আলো জ্বেলে রাখলে বিমান-চলাচলের অসুবিধে হতে পারে। আরও অনেক অসুবিধে আছে !"

তারপর তিনি মণিকার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আজ আমি তোমাদের গ্রামে যাব। রাত্তিরবেলা। তোমাদের সঙ্গে বসে ওই আগুনের পাখিটা দেখব। যদি সত্যি হয়, তা হলে তো সারা পৃথিবীতে বিরাট খবর হয়ে যাবে ! তোমাদের বাড়িতে গেলে কী খাওয়াবে বলো।"

মণিকা বলল, "মাছভাজা। মুরগির মাংস।"

কর্নেল চৌধুরী বললেন, "ওসব তো রোজই খাই। নতুন কী খাওয়াবে বলো ?"

কাকাবাবু বললেন, "কুলের আচার। ওটা মণিকা দারুণ বানায় !"

সবাই হেসে উঠল।

এইরকমই ঠিক হল, আজ রাতে সবাই আসবেন

লোক কী বলেছে? গ্রামের লোক সাধারণ হেলিকপটার চেনে না? এখন এমন কোন গ্রাম আছে, যেখানকার লোক হেলিকপটার দেখেনি? নর্থবেঙ্গলের লোক তো আরও বেশি দেখেছে।"

"হ্যাঁ, হেলিকপটার এখন সবাই চেনে।"

"তবু এখানকার গ্রামের লোক বলেছে, আগুন ছড়াতে-ছড়াতে আর বিকট শব্দ করতে-করতে একটা কিছু অদ্ভুত আকাশযান এখানে আসে। হঠাৎ সব আলো নিভিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সন্তু আর আমিও সেরকমটি দেখেছি। ঠিক তো? গ্রামের লোক কি একবারও বলেছে যে, দু-একবার তারা ওইরকম অদ্ভুত উড়ন্ত চাকি দেখেছে, আর দু-একবার দেখেছে কর্নেল চৌধুরীর সাধারণ হেলিকপটার? প্রত্যেকবার তারা একই জিনিস দেখেছে! মণিকা কিংবা তার বাবা হেলিকপটার চেনে না, তা তো নয়!"

অনির্বাণ আর সন্তু দু'জনেই যেন স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অনির্বাণ আস্তে-আস্তে বলল, "মাই গড! তার মানে, কর্নেল সমর চৌধুরীই তিনবারের চেয়ে বেশি হেলিকপটার নিয়ে এসেছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "অবশ্যই। তিনি হেলিকপটারটাকে আলোটালো দিয়ে সাজিয়ে, আগুনের পিচকিরি ছোটাতে-ছোটাতে নিয়ে এসেছেন। কেমিক্যাল আগুন সহজেই তৈরি করা যায়, সিনেমায় যেরকম দেখায়!"

সন্তু বলল, "কর্নেল চৌধুরী যে নিজের মুখেই বললেন, পরশু রাতে উনি হেলিকপটার নিয়ে আসেননি? সেইজন্যই আমি আরও ভাবলাম..."

কাকাবাবু বললেন, "উনি মিথ্যে কথা বলেছেন!"

সন্তু তবু বলল, "ওঁর ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট যে সাক্ষী দিলেন..."

কাকাবাবু বললেন, "তাকে শিখিয়ে রাখা হয়েছিল। উনি

জানতেন, আমরা গিয়েই ওই কথা জিজ্ঞেস করব। সেইজন্য পাশের ঘরে একটি লোককে সাজিয়ে রেখেছিলেন। হয়তো ওই লোকটিকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে আসেন!"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল চৌধুরী এরকম মিথ্যে কথা বলবেন কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ওঁকেই জিজ্ঞেস করতে হবে। হয়তো উনি ইউ এফ ও কিংবা উড়ন্ত চাকির গুরুত্ব ছড়িয়ে আনন্দ পান। পৃথিবীতে অন্যান্য জায়গাতেও দেখা গেছে, কোনও-কোনও লোক উড়ন্ত চাকির গুজব ছড়িয়ে মজা করার জন্য ছোট প্লেন কিংবা বেলুন উড়িয়ে উদ্ভট সব কাণ্ড করেছে!"

অনির্বাণ বলল, "কর্নেল চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করলে উনি নিশ্চয়ই হা-হা করে হেসে উঠে বলবেন, 'প্র্যাকটিক্যাল জোক! পুলিশকেও ধোঁকা দিয়েছি!' ওঁরা আর্মির লোকেরা পুলিশকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখেন।"

কাকাবাবু বললেন, "প্র্যাকটিক্যাল জোক হতে পারে, আবার অন্য কিছু হতে পারে।"

এবার তিনি জঙ্গলের দিকে ফিরে বললেন, "টোবি দত্ত জঙ্গলের মধ্যে আলো ফেলে কিছু দেখাতে চায়। কিন্তু কেউ সেটা দেখতে চায়নি। এইজন্য গাছের ডালপালা ছেঁটে, রাস্তা মতন বানিয়েছে, যাতে আলোটা যায় অনেক দূর পর্যন্ত!"

অনির্বাণ বলল, "চলুন, আমরা গিয়ে দেখি।"

কাকাবাবু বললেন, "হেঁটে যেতে পারলেই ভাল হত। কিন্তু কতদূর যেতে হবে তা তো জানি না। অন্ধকারে ক্রাচ নিয়ে আমি বেশিদূর যেতে পারব না। জিপেই যেতে হবে। আস্তে-আস্তে এই রাস্তাটা ধরে চালাতে বলো!"

অনির্বাণ বলল, "ড্রাইভার আনিনি। আমিই চালাব।"

বনবাজিতপুরে। টোবি দত্তের ছাদের আলো আর রহস্যময় বায়ুযানটি একসঙ্গে বসে দেখা হবে।

কাকাবাবুরা ফিরে এলেন গ্রামে।

কিন্তু সে-রাত্রে কিছুই করা গেল না। রাত ন'টার পর শুরু হল প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। ঘণ্টাখানেক বাদে ঝড় কিছুটা কমলেও বৃষ্টি চলতেই থাকল। এই বৃষ্টির মধ্যে বাইরে বেরনো যাবে না, আকাশে কিছু দেখাও যাবে না।

কর্নেল চৌধুরী কিংবা অনির্বাণও এল না। মণিকা ও তার বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্তু ও কাকাবাবু শুতে গেলেন নিজেদের ঘরে।

ঘর অন্ধকার, বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে সন্তু। কিছুতেই তার ঘুম আসছে না।

কাকাবাবু এক সময় জিজ্ঞেস করলেন, "কী রে সন্তু, তোর শরীর খারাপ লাগছে নাকি ?"

সন্তু কাতর গলায় বলল, "না, আমার শরীর খারাপ লাগছে না। আমার মনটা কীরকম যেন করছে !"

"কেন, কী হয়েছে ?"

"কাকাবাবু, আমি ভূত মানি না। জানি যে, ভূত বলে কিছু নেই। সবই গল্প। তবু সব কিছু আমার মাথার মধ্যে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।"

"ভূতের গল্প শুনলে গা-ছমছম করে। সেটা বেশ ভালই লাগে। কিন্তু কোনও ভদ্দরলোক ভূতে বিশ্বাস করে নাকি ?"

"কিন্তু আমি যে দেখলাম একটা জ্যান্ত কঙ্কাল।"

"কঙ্কাল কখনও জ্যান্ত হতে পারে না। সন্তু, সোনার পাথরবাটি কি হয় ? মানুষ যখন হাঁটে-চলে, হাত-পা ছোড়ে, তখন মানুষকে চালায় তার মস্তিষ্ক। কঙ্কালের তো থাকে শুধু মাথার

খুলি, তার মধ্যে ব্রেন কিংবা মস্তিষ্ক তো থাকে না। তা হলে একটা কঙ্কাল নড়বে- চড়বে কী করে ?"

"তা তো আমি জানি। কিন্তু একটা কঙ্কাল আমার দিকে এগিয়ে এল। আমাকে দু' হাতে চেপে ধরে উঁচু করে তুলল। অসম্ভব তার গায়ের জোর।"

"সেটা কঙ্কাল হতেই পারে না।"

"কাকাবাবু, আমি আগে কখনও অজ্ঞান হইনি। নিজের কাছেই আমার এত লজ্জা করছে !"

"শোন সন্তু, তুই কী ভাবছিস আমি ব্যাপারটা মাঝপথে ছেড়ে দেব ? টোবি দত্ত-র ছাদে কী করে কঙ্কাল ঘুরে বেড়ায় তা আমি দেখবই দেখব। যেমন করে পারি ওর বাড়ির মধ্যে ঢুকব। ব্যাখ্যা একটা পাওয়া যাবেই।"

"আমি যে ওই ছাদে কাল উঠে ধরা পড়েছিলাম, সেটা তুমি এস পি সাহেব কিংবা অন্যদের বললে না কেন ?"

"দ্যাখ, কঙ্কাল-টঙ্কালের কথা শুনলে ওরা হাসত। তুই টোবি দত্তের বাড়িতে ট্রেসপাস করতে গিয়ে ধরা পড়েছিস। তবু কিন্তু সে তোকে মারধোর করেনি কিংবা কোনও ক্ষতি করেনি। আমার কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এই ব্যাপারে ওর নামে কোনও অভিযোগও করা যায় না।"

তারপর পাশ ফিরে কাকাবাবু বললেন, "সর্বক্ষণ এইসব কথা চিন্তা করার কোনও দরকার নেই। এটা কাঠের বাড়ি, টিনের চাল। টিনের চালে বৃষ্টির কী সুন্দর শব্দ হয়। কান পেতে শোন, মনে হবে রবিশঙ্কর দ্রুতলয়ে সেতার বাজাচ্ছেন। জানলার ধারের গাছগুলোতে হাওয়ায় এমন শোঁ-শোঁ শব্দ হচ্ছে যে, মনে হতে পারে, কাছেই সমুদ্র। মাঝে-মাঝে এমন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, যেন ওটা কোনও ম্যাজিকের খেলা !

একটু বাদে সন্তু ঘুমিয়ে পড়লে কাকাবাবু উঠে গিয়ে ওর গায়ে একটা চাদর টেনে দিলেন।

কোচবিহার শহরে সুশীল গোস্বামীর একটা চায়ের দোকান আছে। সেই দোকানেরই পেছন দিকে একটা ছোট বাড়িতে সে বউ, ছেলেমেয়ে নিয়ে থাকে।

দোকানে বেশ ভিড়, কাউন্টারে বসে আছে সুশীল। অনির্বাণের ড্রাইভার তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এল।

অনির্বাণ বলল, "আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। দোকানের মধ্যে তো বসা যাবে না। অন্য কোথাও বসতে হবে।"

অনির্বাণকে চিনতে পেরেছে সুশীল। পুলিশের এস. পি. সাহেবকে দেখে তার মুখ শুকিয়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না, সার। আমি তো কিছু...মানে, আমার অপরাধ কী হয়েছে?"

অনির্বাণ বলল, "আপনার চিন্তার কিছু নেই। আপনাকে জেরা করতে আসিনি। এঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী, ইনি আপনার কাছে কয়েকটা খবর জানতে চান।"

ক্রাচ বগলে একজন মাঝবয়সী ভদ্রলোক আর তাঁর সঙ্গে একটি কিশোর, এদের দেখেও সুশীল কিছু বুঝতে পারল না। সে সবাইকে নিজের বাড়িতে এনে বসাল। তারপর হঠাৎ কিছু একটা আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলে উঠল, "আপনারা, মানে, আপনারা

দু'জন কি সন্তু আর কাকাবাবু?"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "আমি খোঁড়া বলে অনেকেই আমাকে দেখে চিনে ফেলে।"

সুশীল ব্যস্ত হয়ে বলল, "আপনি আমাদের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আমার কী সৌভাগ্য! আমার বউকে আর ছেলেকে ডাকছি।"

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, "ওসব পরে হবে। আগে কাজের কথা বলে নিই। আপনার বাড়ি দিনহাটায়?"

সুশীল বলল, "হ্যাঁ সার, বাড়ি দিনহাটায়, এখন এখানে দোকান খুলেছি।"

"ওখানে হাই স্কুলে পড়েছেন?"

"হ্যাঁ সার।"

"টোবি দত্ত আপনার সহপাঠী ছিল? ক্লাস নাইনে আপনারা একসঙ্গে পড়েছেন?"

"ও, বুঝতে পেরেছি কার কথা বলছেন। টোবি নয়, তার ডাকনাম ছিল ত্যাপা। ফার্স্ট-সেকেন্ড হত। সে অনেক বছর আগের কথা। এই সেদিন একজনকে দেখলাম, মনে হল যেন আমাদের সেই ত্যাপা। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম, পাত্তাই দিল না। বলল, আমাকে চেনে না!"

"তবু কি আপনার ধারণা, এই টোবি দত্ত আর আপনাদের সেই ত্যাপা একই?"

"হ্যাঁ সার, আমার তো তাই ধারণা। ছোটবেলার বন্ধুদের চেহারা ঠিক মনে থাকে। ত্যাপা অনেকদিন নাকি ফরেনে ছিল, তাই আমাদের ভুলে গেছে।"

"এই ত্যাপা ক্লাস নাইনে স্কুল ছেড়ে চলে গিয়েছিল কেন?"

"আপনি ত্যাপার খবর জানতে চান? তা হলে মামুনকে

মামুন বলল, "ইচ্ছে করে মেরেছিল। রাজু একটা বেল্ট দিয়ে মারতে-মারতে চ্যাঁচাচ্ছিল, 'শয়তান, তোর চোখ গেলে দেব!' সেই বেল্টের লোহার আংটা ত্যাপার একটা চোখে ঢুকে যায়। তখন ত্যাপাকে আমিই ওর বাড়িতে নিয়ে যাই। ত্যাপার বাবা গরিব মানুষ, ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ওই অবস্থায় ছেলেকে দেখে তিনি বললেন, 'অপোগণ্ড ছেলে, তুই দারোগাবাবুকে চটিয়েছিস? এখন আমাদের কপালে আরও কত দুঃখ আছে কে জানে!' তাই শুনে এক হাতে চোখ চেপে ত্যাপা এক দৌড় লাগাল। আমরা পেছন-পেছন ছুটে গিয়েও তাকে ধরতে পারিনি। সেই যে গেল, আর কোনওদিন দিনহাটায় ফেরেনি ত্যাপা। শুনেছি, শিলিগুড়িতে এক পাদ্রি সাহেব সেই অবস্থায় তাকে দেখে দয়া করে আশ্রয় দিয়েছিলেন। তারপর আর কিছু জানি না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চোখের জখম কতখানি ছিল?"

মামুন বলল, "শিলিগুড়িতে আমার আর-এক বন্ধু আখতার সেই সময় ত্যাপাকে দেখেছিল, সে বলেছিল, ত্যাপার একটা চোখ নাকি নষ্টই হয়ে গেছে। ভুল খবর। এই তো সেদিন দেখলাম, ওর দুটো চোখই আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "পাথরের চোখ! সেইজন্যই ওর দৃষ্টি অমন কঠিন আর ঠাণ্ডা মনে হয়।"

অনির্বাণ বলল, "ঠিক বলেছেন তো! টোবি দত্তর দৃষ্টি অস্বাভাবিক, কিন্তু একটা চোখ যে পাথরের হতে পারে, সে-কথা আমার মনে পড়েনি।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যাদের ওরকম হয়, তারা মাঝে-মাঝে পাথরের চোখটা খুলে রাখে।"

সন্তু বিরাট একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই রাজু এখন কোথায়?"

মামুন বলল, "পরের বছরই তার বাবা এই থানা থেকে বদলি হয়ে গেলেন দিনাজপুরে। আর তার কোনও খবর জানি না। পরের যে দারোগা এলেন, তাঁর কোনও ছেলেপুলে ছিল না, তাই কয়েকটা বছর আমরা বেশ শান্তিতে ছিলাম।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "ত্যাপার কোনও ভাইবোন ছিল না?"

মামুন বলল, "একটা ছোট ভাই ছিল। সে লেখাপড়া বিশেষ করেনি। চাকরিবাকরিও পায়নি। স্মাগলারদের সঙ্গে গিয়ে ভিড়েছিল। তারপর তাদের হাতেই খুন হয়ে যায়। তার বাবাকেও ওরাই মেরেছিল শুনেছি। মায়ের খবর জানি না।"

সুশীল অনির্বাণকে বলল, "সার, এদিকে স্মাগলারদের উৎপাত খুব বেড়েছে। পুলিশ সব জেনেও কিছু করে না!"

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্তর পুলিশের ওপর কেন এত রাগ, তা কিছুটা বোঝা গেল!"

অনির্বাণ বলল, "সব পুলিশ তো এক নয়! ডাক্তার, স্কুলমাস্টার, আর্মি অফিসার, ব্যবসায়ী, এদের মধ্যে খারাপ লোক নেই?"

কাকাবাবু বললেন, "রাগের সময় যে এই কথাটা মনে থাকে না!"

সুশীল এর পর তার দোকানের ফিশ ফ্রাই আর চা না খাইয়ে ছাড়ল না। বিদায় নেওয়ার সময় মামুন বলল, "সার, ত্যাপার সঙ্গে দেখা হলে বলবেন, আমরা পুরনো বন্ধুরা তাকে ভুলিনি।"

গাড়িতে উঠে অনির্বাণ বলল, "টোবি দত্তর ব্যাক গ্রাউণ্ড অনেকটাই জানা গেল। এই জায়গাটার ওপর তার রাগ আছে। বোধ হয় সে প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু এতকাল পরে রাজুকে সে পাবে কোথায়?"

ডাকি ? মামুনও আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়ত। সে-ই ছিল ত্যাপার বেশি বন্ধু। পাশেই মামুনের দোকান। সে সেতার, তবলা, হারমোনিয়াম সারায়।"

"ঠিক আছে, ডাকুন।"

সুশীল দৌড়ে বেরিয়ে গেল।

অনির্বাণ বলল, "ত্যাপা বিদেশে গিয়ে নাম বদলে হয়েছে টোবি। একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন, কাকাবাবু ? টোবি আর সুশীল একই ক্লাসে পড়ত, কিন্তু টোবির তুলনায় সুশীলকে বেশি বয়স্ক দেখায়। বিদেশে খাবারদাবার অনেক ভাল, তাই লোকে সহজে বুড়ো হয় না।"

কাকাবাবু বললেন, "শুধু কি খাবারের জন্য ? ওটাও মনের ব্যাপার। যেসব মানুষ জীবনে কোনও ঝুঁকি নেয় না, অ্যাডভেঞ্চার করতে ভয় পায়, সারাটা জীবন একই জায়গায় কাটিয়ে দেয়, তারাই তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যায়।"

সুশীল যাকে ডেকে আনল, তার চেহারা আরও বুড়োটে মতন। চেক লুঙ্গির ওপর সাদা পাঞ্জাবি পরা, চোখে নিকেলের ফ্রেমের চশমা, মাথার চুল প্রায় সব সাদা।

কাকাবাবু বললেন, "আদাব, মামুন সাহেব, বসুন। আপনার স্কুলের বন্ধু ত্যাপা সম্পর্কে কয়েকটা কথা জানতে এসেছি। টোবি দত্তই যে সেই ত্যাপা, আপনি চিনতে পেরেছেন ?"

মামুন আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ চিনেছি। একটা ভ্যানগাড়ি চেপে ঘুরে বেড়ায়। শুনেছি সে খুব ধনী হয়েছে। একদিন পেট্রোল পাম্পে নেমে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন দেখলাম, এ আমাদের সেই ত্যাপা।"

"আপনি কাছে গিয়ে কথা বলেননি ?"

"না। সুশীলের কাছে আগেই শুনেছি, সে সুশীলকে পাত্তা

দেয়নি। তা বড়লোক হয়ে গেলে গরিব বন্ধুদের আর চিনতে পারবে না, এ আর এমন অস্বাভাবিক কী !"

"এক সময় সে আপনার খুব বন্ধু ছিল ?"

"আমরা ক্লাস থ্রি থেকে একসঙ্গে পড়েছি। সব সময় পাশাপাশি বসতাম। মেধাবী ছাত্র ছিল, আমি পড়া জেনে নিতাম তার কাছ থেকে। আমাদের বাড়িতে আসত প্রায়ই।"

"ক্লাস নাইনে সে হঠাৎ স্কুল ছেড়ে চলে গেল কেন ?"

"সেটা সার বড় দুঃখের ঘটনা। তোর মনে নেই রে, সুশীল ?"

সুশীল বলল, "একটু-একটু মনে আছে। সে-সময় আমরাও তাকে কিছু সাহায্য করতে পারিনি। সেইজন্যই বোধ হয় স্কুলের বন্ধুদের ওপর সে আজও রাগ পুষে রেখেছে।"

কাকাবাবু মামুনকে বললেন, "আপনিই ঘটনাটা খুলে বলুন।

মামুন বলল, "ত্যাপারা ছিল বড়ই গরিব। দু' বেলা খাওয়া জুটত না। তারই মধ্যে ত্যাপা পড়াশোনা করত খুব মন দিয়ে। কোনওবার ফার্স্ট, কোনওবার সেকেন্ড হত। আমাদের ক্লাসে আর-একটা ছেলে ছিল, তার নাম বিশু।"

সুশীল বলল, "বিশু না রে, রাজু। থানার দারোগার ছেলে তো ? তার পদবিটা মনে নেই।"

মামুন বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজু। রাজপুত্তুরের মতন চেহারা, কিন্তু ভারী নিষ্ঠুর আর অহঙ্কারী। দারোগার ছেলে বলে আমাদের সে মানুষ বলেই গণ্য করত না। সেও লেখাপড়ায় ভাল ছিল বটে, কিন্তু ত্যাপার সমান না। সেইজন্যই ত্যাপার ওপর ছিল তার খুব হিংসে। আমরা সার, স্কুলে যেতাম হাফপ্যান্ট পরে, আর রাজু পরে যেত ফুলপ্যান্ট। তার পোশাকের বাহার ছিল কতরকম। থানার দারোগার ছেলের তো পয়সার অভাব হয় না।"

মুখ তুলে সে অনির্বাণের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে বলে উঠল, "মাফ করবেন সার, আপনার সামনে এই কথাটা বলে ফেলেছি !"

অনির্বাণ কাষ্ঠহাসি দিয়ে বলল, "পুলিশ ঘুষ খায়, এ-কথা তো সবাই জানে !"

মামুন বলল, "আপনারা ওপরতলার অফিসার, আপনাদের কানে অনেক খবরই পৌঁছয় না ! কিন্তু নীচের তলায়, থানায়-থানায় ঘুষের রাজত্ব ! এখানে তো আমাদের ওপর পুলিশ জুলুম করে।"

সুশীলও সাহস সঞ্চয় করে বলল, "আমি সামান্য একটা চায়ের দোকান চালাই, আমার কাছেও পুলিশ ঘুষ চায়। এদিকে যে স্মাগলাররা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের কিছু বলে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব কথা পরে হবে। স্কুলের ঘটনাটা আগে শুনি।"

মামুন বলল, "একদিন স্কুলে ওই রাজুর মানিব্যাগ চুরি গেল। আমরা পাঁচ নয়া, দশ নয়া পয়সা নিয়ে স্কুলে যেতাম। আমাদের আর কারও মানিব্যাগ ছিল না। রাজুর ব্যাগে গোছা-গোছা টাকা। সেদিন ওর ব্যাগে ছিল নাকি আড়াইশো টাকা ! সে তো অনেক টাকা ! আমাদের বাপ-চাচারা এক মাসে অত টাকা রোজগার করতেন। রাজুর ব্যাগ হারিয়েছে বলে সারা স্কুলে তোলপাড় হয়ে গেল।"

অনির্বাণ বলল, "রাজু সন্দেহ করল ত্যাপাকে ?"

মামুন বলল, "সত্যিই ব্যাগ হারিয়েছিল কিনা তাই-বা কে জানে ! ত্যাপার ওপর তো আগেই রাগ ছিল। ত্যাপা ছিল জেদি আর গোঁয়ার। মান-সম্মান জ্ঞান ছিল খুব। সেদিন আবার ত্যাপার পকেটে ছিল কুড়ি টাকা। স্কুলে কয়েক মাসের মাইনে

বাকি পড়েছিল, সেই মাইনে দিতে এসেছিল। রাজু জিজ্ঞেস করল, 'তুই হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেলি ?' ত্যাপা কিছুতেই তা বলবে না।"

সুশীল বলল, "তারপর শুরু হল মার। কী মার মারল ত্যাপাকে। দারোগার ছেলে বলে রাজুর অনেক চ্যালা ছিল। আমরা ভয়ে কিছু বলতে পারিনি।"

মামুন বলল, "আমি ত্যাপার পাশে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক লাথি-ঘুসি খেয়েছি। ত্যাপাকে ওরা টানতে-টানতে নিয়ে গেল থানায়। সেখানেও রাজুর বাবা কোনও বিচার না করেই মারতে লাগলেন। ত্যাপার একটা চোখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল ঝরঝর করে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "চোখে মেরেছিল ?"

ব্যবস্থা নেবে না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, টৌবি দত্তর পিঠে ছুরি গেঁথে গিয়েছিল, তবু সে স্বাভাবিকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে কী করে ?"

কাকাবাবু বললেন, "তুই কি এখনও ভাবছিস, টৌবি দত্তর অলৌকিক ক্ষমতা আছে ? ছুরিটা বেশিদূর ঢোকেনি, তাই ক্ষতটা সেরে গেছে।"

অনির্বাণ বলল, "টৌবি দত্তর গায়েও বেশ জোর আছে। সে লোকগুলোকে ঘুসি চালিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। তাতে বোঝা যায়, সে সঙ্গে ছুরি, ছোরা, বন্দুক রাখে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তা বলে সে প্রতিশোধ নেবে না ? প্রকাশ্য রাস্তায় কয়েকজন লোক তাকে খুন করতে গেল, তার মতন একজন তেজি লোক সেটা হজম করে যাবে ? পুলিশ কিছু না করলেও সে নিশ্চয়ই ওই লোকগুলোকে খুঁজে বের করবে !"

অনির্বাণ বলল, "তা বলে আপনি বলতে চান, টৌবি দত্তই এই লোকগুলোকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছে ? কিন্তু গলায় ওরকম অদ্ভুত আঙুলের ছাপ..."

সন্তু উত্তেজিতভাবে কিছু বলার জন্য ডাকল, "কাকাবাবু..."

কাকাবাবু তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "সেসব পরে দেখা যাবে। অনির্বাণ, তুমি আগে খোঁজ নাও। এই তিনজন লোকই এক দলের কি না ! থানাগুলোতে চাপ দাও, ওরা গুণ্ডা-চোরাচালানিদের ঠিকই চেনে ! অন্য গ্রহের প্রাণীরা এসে কোচবিহারের গ্রামের মানুষদের খুন করছে, এ-কথা প্রকাশ্যে বোলো না, লোকে হাসবে !"

অনির্বাণ বলল, "খবরের কাগজেও এই ধরনের লিখছে !"

কাকাবাবু খানিকটা ধমকের সুরে বললেন, "খবরের কাগজে লিখুক ! আমাদের আপাতত ইউ এফ ও নিয়ে মাথা না ঘামালেও

চলবে। তোমরা গ্রামের মানুষদের কথায় পাত্তা দাও না। ওদের কথাগুলো ভাল করে ভেবে দেখলে বুঝতে, ইউ এফ ও'র ব্যাপারটা পুরো ধাপ্পা !"

সন্তু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "গ্রামের লোকরাই তো প্রথম থেকে বলছে, হেলিকপ্টার নয়, আগুনের পাখি, অন্য গ্রহের আকাশযান এসেছে পাঁচ-ছ'বার !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, এই কথাগুলোরই ঠিক-ঠিক মানে যদি আমরা বুঝতে না পারি, তা হলে আর আমরা শিক্ষিত কিসে ?"

সন্তু তবু চোখ-মুখ খুচিয়ে রইল। কাকাবাবুর কথাগুলি তার ধাঁধার মতন মনে হচ্ছে।

নাছোড়বান্দার মতন সে বলল, "কাকাবাবু, আমি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে দাও !"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "যথাসময়ে বলব। এর মধ্যে আরও ভেবে দ্যাখ নিজেই বুঝতে পারিস কিনা !"

দুপুরবেলা বেশ জোর বৃষ্টি হয়ে গেল খানিকক্ষণ। তারপর আকাশ একেবারে পরিষ্কার। বেশ কয়েকদিন পর ঝকঝকে নীল আকাশ দেখা গেল।

হেডমাস্টারমশাই স্কুল থেকে ফেরার পর সবাই মিলে বারান্দায় চা খেতে বসলেন।

কথায়-কথায় হেডমাস্টারমশাই বললেন, "দিনহাটার একটা

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো রাজুও এখানে আবার ফিরে এসেছে। কোনও গুণ্ডার দলের সর্দার হয়েছে!"

অনির্বাণ বলল, "কাকাবাবু, আপনি খুনটুনের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চান না। কিন্তু বনবাজিতপুরে যদি দু'রকম হেলিকপটার আসে, তা হলে তার মধ্যে একটা ইউ এফ ও হতেই পারে। এ সম্ভাবনাটা আর উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আর কোনও হেলিকপটার এখানে আসা অসম্ভব।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর মতন তুমিও ইউ এফ ও বিশ্বাসী হয়ে গেলে দেখছি। কিন্তু ইউ এফ ও'র সঙ্গে তোমার এই খুনটুনের কী সম্পর্ক?"

অনির্বাণ বলল, "যদি পৃথিবীর বাইরে থেকে কিছু এসে থাকে, তার মধ্যে কী ধরনের অদ্ভুত প্রাণী থাকবে তা আমরা জানি না। তারা খুব হিংস্র হতে পারে।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "অনেক কমিক স্ট্রিপে গল্প আর ছবি থাকে, মহাকাশে ইঁদুরের মতন প্রাণী মানুষের চেয়েও অনেক শক্তিশালী আর বুদ্ধিমান। সন্তু ওইসব গল্প খুব পড়ে। তুমিও পড়ো নাকি?"

সন্তু বলল, "আজকাল ওগুলো সবাই পড়ে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও তো কয়েকখানা পড়েছি তোর ঘর থেকে নিয়ে। সায়েন্স ফিকশন হল একালের রূপকথা। পড়তে ভালই লাগে। কিন্তু অনির্বাণ, অন্য গ্রহের অদ্ভুত প্রাণীরা এসে তোমার এই কোচবিহারের সাধারণ মানুষদের মারবে কেন?"

অনির্বাণ বলল, "তা ছাড়া যে আর কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। ইউ এফ ও'র প্রাণীরা হয়তো রাত্তিরে মাটিতে নেমে ঘুরে বেড়ায়। কোনও গ্রামের মানুষ দৈবাৎ তাদের দেখে ফেললেই সেই মানুষটাকে তারা মেরে ফেলছে গলা টিপে। যে ক'জন খুন

হয়েছে, তাদের প্রত্যেকেরই মুখে সাঙ্ঘাতিক ভয়ের ছাপ। একজন ভয়েই মারা গেছে, আর দু'জনকে গলা মুচড়ে মেরেছে। কিন্তু আঙুলের ছাপ মানুষের মতন নয়! এই ব্যাপারটাতেই আমরা ধাঁধায় পড়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁঃ, আচ্ছা, এই যে লোকগুলো খুন হয়েছে, এদের কারও সঙ্গে কারও কোনও সম্পর্ক আছে?"

অনির্বাণ বলল, "এরা এক গ্রামের লোক নয়। কারও সঙ্গে কারও চেনা ছিল বলেও জানা যায়নি। শেষ যে লোকটা খুন হয়েছে, তার নাম ভবেন সিকদার। লেখাপড়া শেখেনি, বেকার, তিরিশ-পঁয়তিরিশ বছর বয়েস। পাড়ায় একটু মাস্তানি করত, কিন্তু এমন কিছু না, পুলিশের খাতায় নাম নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "বেকার ছেলে, স্বাস্থ্য ভাল, কিছু একটা কাজ করতে চায়, অথচ আমাদের দেশ এদের কোনও কাজ দিতে পারে না। এটাই তো আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। শেষপর্যন্ত এই ছেলেদের কেউ-কেউ বদ লোকদের পাল্লায় পড়ে। এই ছেলেটা চোরাচালানিদের দলে যোগ দেয়নি তো?"

অনির্বাণ বলল, "তা অসম্ভব কিছু নয়। সীমান্ত এলাকায় স্মাগলারদের উৎপাত তো আছেই। পুলিশ আর কতদিক সামলাবে!"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ আবার বললেন, "টোবি দত্তকে যারা ছুরি মেরেছিল, তাদের কেউ ধরা পড়েছে?"

অনির্বাণ আমতা-আমতা করে বলল, "না, মানে, টোবি দত্ত থানায় কোনও অভিযোগ জানায়নি। ওখানকার থানাও আর বেশিদূর এগোয়নি, আরও অনেক কাজ থাকে তো!"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, একটা লোককে রাস্তার ওপর কয়েকজন লোক ঘিরে ধরে ছুরি মারল, পুলিশ তার জন্য কোনও

স্কুলে কে একজন লোক দু' লক্ষ টাকা দান করেছে। হঠাৎ এত টাকা পেয়ে সবাই অবাক! টাকাটা কে দিয়েছে তা জানা যাচ্ছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "ত্যাপা নামে একটি গরিবের ছেলে একসময় ওই স্কুলে পড়ত। বিদেশে গিয়ে সে খুব বড়লোক হয়েছে। খুব সম্ভবত টাকাটা সে-ই দান করেছে!"

হেডমাস্টারমশাই বললেন, "আমাদের গ্রামের টোবি দত্তও তো খুব বড়লোক। তার মামাদের অত বড় বাড়িটা কিনেছে। আমাদের স্কুলের বাড়িটা সারানো দরকার, সে কিছু টাকা দিলে পারত! দিয়েছে মোটে পাঁচ হাজার টাকা!"

মণিকা গরম-গরম বেগুনি আর পেঁয়াজি ভেজে এনেছে মুড়ির সঙ্গে। তোফা খাওয়া হল।

মণিকা জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু আজ সন্ধেবেলা কী করা হবে? মিলিটারির সেই সাহেব আসবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক জানি না। কোনও খবর পাইনি।"

মণিকা বলল, "আজ কিন্তু আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। সকালে আপনারা কোচবিহার শহরে গিয়েছিলেন, তখন আমাকে স্কুলে যেতে হল!"

কাকাবাবু হাসলেন।

একটু বাদে হেডমাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন এক জায়গায় ছাত্র পড়াতে। মণিকা বাথরুমে গা ধুতে গেল।

কাকাবাবু সন্তুকে ফিসফিস করে বললেন, "আজ সন্ধের সময় আমরা এক জায়গায় যাব। সেখানে মণিকাকে কিছুতেই নিয়ে যাওয়া যাবে না। কিন্তু ও ছাড়তে চাইবে না। কী করা যায় বল তো?"

সন্তু বলল, "আমরা চুপিচুপি এখনই কেটে পড়ি?"

কাকাবাবু বললেন, "আরও ঘণ্টাখানেক দেরি আছে। তা ছাড়া ওকে কিচ্ছু না বলে গেলে বেচারি খুব দুঃখ পাবে। একটা কাজ করা যায়। তুই বরং আজ থেকে যা এখানে। তুই ওর সঙ্গে গল্প করবি। আমি ঘুরে আসি।"

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, "না, আমি থাকব না। আমি যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এক কাজ কর। দু'জনে একসঙ্গে বেরনো যাবে না। তুই আগেই সরে পড়। তুই গিয়ে নদীর ধারে লুকিয়ে বসে থাক। সেই প্রথমবার যেখানে বসেছিলাম, যেখানে তোকে কুকুরটা আক্রমণ করেছিল। ঝোপঝাড়ের মধ্যে বসে থাকবি, নদীর ওপারেও থাকতে পারিস, কেউ যেন তোকে দেখতে না পায়।"

সন্তু তখনই জুতো-মোজা পরে তৈরি হয়ে নিল। তারপর এক দৌড়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

কিছুক্ষণ পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগলে নিয়ে যেই ঘর থেকে বেরিয়েছেন, অমনই মণিকা জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

কাকাবাবু বললেন, "যাই, একটু বেড়িয়ে আসি।"

মণিকা বলল, "সন্তু কোথায় গেল?"

কাকাবাবু অম্লানবদনে বললেন, "ও তো পাঁচটার বাস ধরে কোচবিহার টাউনে চলে গেল!"

"কেন?"

"ও যে তোমাদের আগুন-পাখির ছবিগুলো তুলেছিল, তার প্রিন্টগুলো দেখার জন্য ছটফট করছিল। তা ছাড়া, কলকাতায় একটা ফোন করতে হবে।"

"রাত্তিরে ফিরবে কী করে? আর তো বাস নেই!"

"অনির্বাণ যদি গাড়ি নিয়ে আসে, তা হলে তার সঙ্গে ফিরবে।

জঙ্গলের ভেতর এরই মধ্যে অন্ধকার নেমে এসেছে। থেমে গেছে পাখির ডাক। এই বনে মানুষ বিশেষ আসে না, মাঝে-মাঝে হাতির উৎপাত হয় বলে শোনা যায়। হাতিদের যাওয়া-আসার একটা রাস্তা আছে। একবার দু'জন কাঠুরেকে হাতির পাল পদদলিত করেছিল। সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। টৌবি দত্ত তখনও এখানে আসেনি। হাতি দেখাবার জন্য টৌবি দত্ত নিশ্চয়ই এদিকটায় আলো ফেলে না।

একটু দূর যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "অনির্বাণ, তুমি জাপানে খোঁজ নিয়েছিলে ?"

অনির্বাণ বলল, "কলকাতার আই বি থেকে জাপানে ফোন করেছিল। আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। টৌবি দত্ত এক জাপানি মহিলাকে বিয়ে করেছিল। কিছুদিন আগে সেই স্ত্রীটি গাড়ি-দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর থেকেই টৌবি দত্তর মাথায় গোলমাল দেখা দেয়। তাকে মানসিক চিকিৎসার একটি হাসপাতালে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছিল। চাকরিও ছাড়তে হয় সেইজন্য।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ। আমি এইরকমই কিছু ভেবেছিলাম। টৌবি দত্ত রুক্ষ আর অভদ্র ধরনের ব্যবহার করে। এইরকম স্বভাব নিয়ে কি সে জাপানে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকরি করতে পারত ? জাপানিরা অতি ভদ্র হয়। তা হলে নিশ্চয়ই হঠাৎ কোনও কারণে টৌবি দত্তর স্বভাবের পরিবর্তন হয়েছে। এমনও হতে পারে, মাথার গোলমাল হওয়ার পর থেকেই তার সব পুরনো কথা মনে পড়ে গেছে। এখানকার লোকেরা এক সময় তার ওপর কত খারাপ ব্যবহার করেছিল, সেইসব ভেবে-ভেবে রাগে ফুঁসতে থাকে।"

অনির্বাণ বলল, "রাগ জিনিসটা কিন্তু মানুষের খুব ক্ষতি

করে।"

কাকাবাবু বললেন, "মাঝে-মাঝে রেগে ওঠা ভাল। সব সময় ভাল নয়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকাবাবু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কখনও রাগ করতেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই করতেন। হয়তো রেগে চ্যাঁচামেচি করতেন না। ভেতরে-ভেতরে ফুঁসতেন। ওঁর একটা কবিতা আছে, 'নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস ...' সেটা পড়লেই মনে হয়, লেখার সময় উনি খুব রেগে ছিলেন।"

অনির্বাণ বলল, "আর তো রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বড়-বড় ঝোপ ঠেলে গাড়ি চালানো মুশকিল।"

কাকাবাবু ঝুঁকে দু'পাশ দেখে বললেন, "এখানেও কিছু-কিছু গাছের ডাল কাটা হয়েছে। আলোটা এদিকেই আসে। তুমি যতদূর পারো চালাও। তারপর নেমে পড়তে হবে !"

অনির্বাণ বলল, "জঙ্গলে আর কিছুই তো দেখা গেল না এ-পর্যন্ত। এদিকে আলো ফেলে কী দেখাতে চায় টৌবি দত্ত ?"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "হয়তো শেষপর্যন্ত দেখা যাবে কিছুই নেই। তখন যেন আমার ওপর সব দোষ চাপিয়ো না। ভুল তো হতেই পারে। এটা আমার একটা থিয়োরি।"

একটু বাদে জিপটা থেমে গেল। জল-কাদায় চাকা পিছলে যাচ্ছে, সামনে বড়-বড় ঝোপ।

অনির্বাণ বলল, "আর বোধ হয় সামনে এগিয়ে লাভ নেই। আজকের মতন এখান থেকেই ফেরা যাক।"

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, "নেমে পড়, নেমে পড় !"

তিনিই প্রথম নেমে একটা পেন্সিল টর্চ জ্বাললেন। কাছেই একটা গাছের সদ্য কাটা ডাল পড়ে আছে। ডালটা তুলে নিয়ে

না হলে থেকে যাবে।"

"আমাকে না বলে চলে গেল, ভারী দুষ্টু তো ! দাঁড়ান কাকাবাবু, আমি চটি পরে আসি, আমিও যাব আপনার সঙ্গে !"

কাকাবাবু অপলকভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলেন মণিকার দিকে। এই মেয়েটির সাহস আছে। ধরাবাঁধা গণ্ডির বাইরে যেতে চায়। এরকম মেয়ে বেশি দেখা যায় না। তবু আজ ওকে সঙ্গে নেওয়ার ঝুঁকি খুব বেশি।

তিনি আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "না মণিকা, আজ আমি একাই যাব।"

মণিকা ভুরু তুলে বলল, "এই গ্রামের মধ্যে আপনি একা কোথায় বেড়াবেন ? আমি আপনাকে সব চিনিয়ে দেব।"

কাকাবাবু নরম গলায় বললেন, "চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। আমি নদীর ধারে ঘুরব। তোমাকে সঙ্গে আসতে হবে না। শুধু তাই নয়, তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, এর পরেও তুমি একা-একা বেরিয়ে পড়বে না। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি বাড়িতে থাকবে।"

মণিকা কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "কেন, আমি আপনার সঙ্গে গেলে কী হয়েছে ? কেন নেবেন না আমাকে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ফিরে এসে বলব। ফিরে এসে তোমাকে একটা দারুণ গল্প শোনাব। কিন্তু প্রতিজ্ঞা রইল, তুমি কিছুতেই আজ রাতে বাইরে বেরোবে না।"

কাকাবাবু মণিকার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে একটু আদর করলেন। তারপর মণিকাকে সেই অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে।

গ্রামের রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। যেন তিনি অলসভাবে ভ্রমণ করছেন। টোবি দত্তর বাড়ির ধারেকাছে

ঘেঁষলেন না। নদীর ধারে যখন পৌঁছলেন, তখন বিকেল প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমের আকাশ লাল। সন্তুকে কোথাও দেখা গেল না। কাকাবাবু আকাশের দিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ সূর্যাস্তের শোভা দেখলেন।

নদীর ওপর থেকে একটা শিসের শব্দ ভেসে এল।

কাকাবাবু দু'বার মাথা ঝোঁকালেন। তারপর নেমে পড়লেন নদীতে।

নদীতে জল বেশি নেই, কিন্তু মাঝখানে বড়-বড় পাথর। অন্য লোকেরা অনায়াসে পার হতে পারে। কিন্তু ক্রাচ নিয়ে যাওয়ার বেশ অসুবিধে। কাকাবাবু খোঁড়া পা-টা ঠিকমতন মাটিতে পাততে পারেন না, তবে সেই পায়েও একটা বিশেষ ধরনের জুতো পরে থাকেন। সেই জুতো খোলার অনেক ঝামেলা বলে তিনি প্যান্ট-জুতো ভিজিয়ে ফেললেন।

অন্য পারে ওঠার পর সন্তু একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে বলল, "আমি টোবি দত্তর বাড়ির দিকে নজর রেখেছি। ছাদে কাউকে দেখা যায়নি।"

কাকাবাবু সে-কথায় কোনও গুরুত্ব না দিয়ে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "দ্যাখ, কিছু-কিছু গাছের ডাল কেউ ছেঁটেছে বোঝা যাচ্ছে।"

সন্তু বলল, "জঙ্গলের গাছ কাটা তো অপরাধ।"

কাকাবাবু বললেন, "পুরো গাছ কাটেনি। ডালপালা ছাঁটা তেমন অপরাধ নয়। মনে হয়, জঙ্গলের মধ্যে কেউ একটা রাস্তা বানাতে চেয়েছে।"

কাকাবাবু ঘড়ি দেখলেন। তখনই নদীর এ-ধারে একটা গাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। একটা কালো রঙের জিপগাড়ি থেকে নেমে এল অনির্বাণ।

পরীক্ষা করে বললেন, "হ্যাঁ, এইদিকেই এগোতে হবে।"

ঝোপঝাড় ঠেলে-ঠেলে যেতে কাকাবাবুরই অসুবিধে হচ্ছে বেশি। তবু তিনি যাচ্ছেন আগে-আগে।

অনির্বাণ বলল, "এই সময় যদি একটা হাতির পাল এসে পড়ে?"

সন্তু বলল, "তা হলে আমাদের শুঁড়ে তুলে লোফালুফি খেলবে!"

কাকাবাবু বললেন, "কোনওক্রমে যদি একটা হাতির পিঠে চেপে বসতে পারিস, তা হলে হাতিটা আর তোকে নামাতে পারবে না।"

অনির্বাণ বলল, "অত সহজ নয়। হাতিটা তখন একটা বড় গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঘষবে। তাতেই চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়ে যাব!"

সন্তু বলল, "সামনে একটা আলো!"

কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে টর্চ নিভিয়ে দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন, "চুপ, কেউ শব্দ কোরো না। ঝোপঝাড়ের আড়ালে, বেশ খানিকটা দূরে দেখা যাচ্ছে মিটমিটে আলো। সেই আলোর আশেপাশে কী আছে, তা দেখা যাচ্ছে না। কোনও শব্দও নেই।"

একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর ওরা পা টিপে-টিপে এগোতে লাগল।

কাকাবাবু মাঝে-মাঝে মাটির দিকে টর্চ জ্বেলে রাস্তা দেখে নিচ্ছেন।

আরও খানিকটা যাওয়ার পর চোখে পড়ল একটা ভাঙা বাড়ি। প্রায় ধ্বংসস্তূপই বলা যায়। কোনও এক সময় হয়তো কোচবিহারের রাজারা এখানে এই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে শখের বিশ্রাম ভবন বানিয়েছিলেন। এখন ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যাচ্ছে,

কেউ খবরও রাখে না। বাড়িটার একটা কোণ থেকে আলোটা আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "টোবি দত্ত তা হলে এই বাড়িটাকেই দেখায়।"

অনির্বাণ বলল, "এইরকম একটা ভাঙা বাড়ি দেখাবে কী জন্য? আলো জ্বলছে যখন, সাধারণ চোর-ডাকাতদের আখড়া হতে পারে। তার জন্য ওর এত আলোটালো ফেলার কী দরকার?"

কাকাবাবু বললেন, "ধরো, যদি তোমাদের ইউ এফ ও কিংবা উড়ন্ত চাকির অদ্ভুত প্রাণীরা এখানে বাসা বেঁধে থাকে?"

অনির্বাণ বলল, "উড়ন্ত চাকি যে আসেনি, তা তো প্রমাণ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছুই প্রমাণ হয়নি। কারা এই ভাঙা বাড়িতে আলো জ্বেলেছে, তা না দেখা পর্যন্ত সবটা বোঝা যাবে না।"

কাকাবাবু আবার এগোতে যেতেই অনির্বাণ তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "দাঁড়ান। ওর ভেতরে ঠিক কতজন আছে তার ঠিক নেই। আমরা মাত্র তিনজন। এক কাজ করা যাক, আমরা এখন ফিরে যাই। তারপর পুলিশ ফোর্স নিয়ে আবার এসে পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "ফিরে যাব? ভেতরটা দেখার এত ইচ্ছে হচ্ছে, ফিরে এসে যদি কিছুই না পাই! ততক্ষণে যদি সব ভোঁ-ভাঁ হয়ে যায়? তুমি বরং ফিরে যাও অনির্বাণ। আরও পুলিশ ডেকে আনো। আমি আর সন্তু এইদিকটা সামলাই ততক্ষণ।"

অনির্বাণ বলল, "অসম্ভব ! আপনাদের দু'জনকে ফেলে রেখে আমি চলে যেতে পারি ? আমিও তা হলে এখানে থাকব ।"

কাকাবাবু বললেন, "তিনজনের পাশাপাশি থাকা চলবে না। ভেতরে যদি একটা দল থাকে, তা হলে বাইরে নিশ্চয়ই পাহারাদার রেখেছে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে, পাহারাদারদের ঘায়েল না করে ভেতরে ঢোকা যাবে না।"

সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি খুব বেশি বেকায়দায় পড়ে যাস, তা হলে একটা শিস দিবি !"

বাড়িটার যেদিকে আলো জ্বলছে, সন্তু চলে গেল তার উলটো দিকে। আকাশ আজ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায় সব কিছুই অস্পষ্টভাবে দেখা যায়। বাড়িটা এমনই ভাঙা যে, মাঝে-মাঝে দেওয়াল হেলে পড়েছে। চতুর্দিকে ইট ছড়ানো। এমন জায়গা দেখলেই মনে হয় এখানে সাপখোপ আছে। সাপের ভয়েই সন্তু মাটির দিকে চেয়ে-চেয়ে হাঁটতে লাগল।

বেশ খানিকটা ঘুরেও সে কোনও পাহারাদার দেখতে পেল না।

এক জায়গায় মনে হল, ভেতরে ঢোকার একটা দরজা আছে। দরজাটা খোলা। একটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দরজার দিকে নজর রাখতে গেল যেই, অমনই হুড়মুড় করে কী যেন এসে পড়ল তার ঘাড়ে।

প্রথমে সে ভাবল, একটা বাঘ। তারপর ভাবল, হনুমান। তারপর বুঝতে পারল, মানুষ। সে চিন্তাই করেনি যে, পাহারাদার গাছের ওপর উঠে বসে থাকতে পারে ! লোকটা গায়ে একটা কালো চাদর মুড়ি দিয়ে আছে।

পাহারাদারের শরীরের ওজনে সন্তু হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে মাটিতে।

পাহারাদারটি বলল, "আরে, এ যে দেখছি একটা বাচ্চা !"

সন্তু কেঁদে ফেলে বলল, "ওরে বাবা রে, আমি ভেবেছি ভূত। ভূতে আমাকে মেরে ফেলল !"

পাহারাদারটি বলল, "অ্যাই, ওঠ। তুই এখানে কী করছিস ?"

সন্তু উঠে বসে, চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি।"

পাহারাদারটি ধমক দিয়ে বলল, "রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিস মানে ? এই জঙ্গলে রাত্তিরবেলা ঢুকেছিস কেন ?"

সন্তু বলল, "বাবা মেরেছে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

পাহারাদারটির হাতে একটা লম্বা ছুরি। সেটা নাচাতে-নাচাতে বলল, "তোর বাড়ি কোন গ্রামে ?"

সন্তু বলল, "আমি যমের বাড়িতে থাকি। তুমি যাবে সেখানে ?"

লোকটি বুঝতে না পেরে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, "কোথায় ?"

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে তার মুখে একটা লাথি কষাল। এত দ্রুত ব্যাপারটা ঘটল যে, লোকটা বুঝতেও পারল না। তা ছাড়া তার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট একটি ছেলে যে এইরকমভাবে মারতে সাহস করবে, তা সে কল্পনাও করেনি।

লোকটা ছিটকে পড়ে গেল খানিকটা দূরে। হাতের ছুরিটা খসে

গেছে। সেটা সঙ্গে-সঙ্গে কুড়িয়ে নিয়ে সন্তু লোকটার বুকের ওপর চেপে বসে বলল, "আমি যমের বাড়ি থেকে আসছি। আমি চেহারা বদলাতে পারি। এই ছোট দেখছ, একটু পরেই প্রকাণ্ড হয়ে যাব। চ্যাঁচালেই তোমার গলাটা কেটে ফেলব, হাঁ করো, হাঁ করো!"

লোকটি ভয়ে-ভয়ে হাঁ করতেই সন্তু নিজের পকেটের রুমালটা ভরে দিল ওর মুখে। তারপর নির্দয়ভাবে ওরই ছুরি দিয়ে ওর চাদরটা ফালা-ফালা করে কেটে, এক-একটা টুকরো দিয়ে বাঁধল ওর মুখ, হাত, পা।

সন্তু বলল, "এখানেই শেষ নয়। এবার ছুরিটা বসিয়ে দেব তোমার বুকে। খুব তাড়াতাড়ি যমের বাড়ি চলে যাবে।"

আতঙ্কে লোকটার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। কথা বলতে পারছে না, প্রবলভাবে মাথা নাড়ল।

সন্তু বলল, "তা হলে এখানে চুপ করে শুয়ে থাকো।"

লোকটাকে ফেলে রেখে, ছুরিটা হাতে নিয়ে সন্তু এগিয়ে গেল আলোটার দিকে।

একটু পরেই দেখল, কাকাবাবু আর অনির্বাণ আর-একটা লোকের হাত-পা বাঁধছে।

অনির্বাণ বলল, "একে কাবু করতে আমার কোনও অসুবিধেই হয়নি। নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরা চারদিক ঘুরে এসেছি, আর কেউ নেই। এবার ভেতরে ঢোকা যাক।"

সামনেই একটা দরজা, তার ওপাশে একটা চাতাল। তার কোনও দেওয়াল নেই। আলোটা কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। তবে কোথায় যেন মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে একটু-একটু।

চাতালটা ঘুরতে-ঘুরতে চোখে পড়ল একটা সিঁড়ি। সেটা নেমে গেছে নীচের দিকে।

কাকাবাবু বললেন, "মাটির নীচেও ঘর আছে মনে হচ্ছে।"

অনির্বাণ বলল, "রাজা-মহারাজাদের বাড়িতে থাকত।"

সেই সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নামতেই আলোটা দেখা গেল। সিঁড়ির পাশে-পাশে দুটো ঘুলঘুলি, সেখান থেকে আলোটা আসছে।

অনির্বাণ আর কাকাবাবু দুটো ঘুলঘুলিতে চোখ রাখলেন।

নীচে একখানা ঘর বেশ পরিচ্ছন্ন। দেওয়াল-টেওয়াল ভাঙা নয়। মেঝেতে একটা শতরঞ্চি পাতা, তার মাঝখানে হ্যাজাক বাতি জ্বেলে বসে আছে তিনজন লোক। তারা খুব মনোযোগ দিয়ে বিস্কুটের মতন সোনার চাকতি গুনছে। অনেক চাকতি। পাশে তিন-চারটে কাগজের বাক্স।

কাকাবাবু সরে এসে সন্তুকে দেখতে দিলেন। তারপর তাকালেন অনির্বাণের দিকে। অনির্বাণ মাথা ঝাঁকাল।

ক্রাচের যাতে শব্দ না হয়, সেইজন্য কাকাবাবু ক্রাচ দুটো বগল থেকে সরিয়ে দেওয়াল ধরে-ধরে নামতে লাগলেন। সিঁড়ির নীচে একটা মজবুত লোহার গেট, মনে হয় নতুন। গেটটা অবশ্য এখন খোলা!

তিনজন প্রায় একসঙ্গে ঢুকে পড়ল ঘরে। ভেতরের লোকেরা সোনা গুনতে এতই মগ্ন হয়ে ছিল যে, এদিকে খেয়ালই করেনি। আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলতেই তারা দেখল, দু'জনের হাতে রিভলভার, একজনের হাতে ছুরি।

অনির্বাণ গম্ভীরভাবে আদেশ দিল, "সবাই ঘরের এককোণে চলে যাও। মাথার ওপর হাত তুলে থাকো। কোনওরকম পালাবার চেষ্টা করলেই গুলি চালাব।"

তারপর সে খুবই বিস্ময়ের সঙ্গে বলে উঠল, "এ কী ? ফাগুলাল না ?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওকে তুমি চেনো ?"

অনির্বাণ বলল, "ও তো পুলিশের লোক। ওর ওপরেই টোবি দত্তর বাড়ির ওপর নজর রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল। ব্যাটার এই মতলব ?"

কাকাবাবু বললেন, "রক্ষকই ভক্ষক। পুলিশের চাকরিতেও মাইনে পায়, আর স্মাগলারদের সঙ্গে থেকেও অনেক রোজগার করে।"

ফাগুলাল ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে লজ্জায় মুখ ঢাকার চেষ্টা করছে।

কাকাবাবু বললেন, "এই লোক তিনটিকে বাঁধতে হবে। দড়ি জোগাড় করা দরকার। সোনাগুলোও ফেলে রেখে যাওয়া যাবে না। সন্তু, তুই সোনাগুলো কাগজের বাক্সে ভর তো !"

অনির্বাণ বলল, "এটা একটা স্মাগলারদের ডেন, বোঝা গেল ! এইটা দেখিয়ে দেওয়ার জন্য টোবি দত্ত অত আলো-টালোর ব্যবস্থা করেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হয়তো আরও কিছু আছে। খুঁজে দেখতে হবে। স্মাগলারদের ওপর টোবি দত্তর খুব রাগ। ওর ভাই আর বাবাকে স্মাগলাররাই খুন করেছে। যারা ওর পিঠে ছুরি মেরেছিল, তারাও বোধ হয় এই দলের।"

ফাগুলাল হঠাৎ নিচু হয়ে শতরঞ্চির একটা কোনা ধরে জোরে টান মারল।

কাকাবাবু একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। টাল সামলাতে পারলেন না। অনির্বাণও তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একমাত্র সন্তু শতরঞ্চিতে পা দেয়নি, তার কিছু হল না।

কাকাবাবু হাত থেকে রিভলভারটা ছাড়েননি। কিন্তু সেটা তোলার সময় পেলেন না। ফাগুলাল একলাফে তাঁর সেই হাতটার ওপর পা চেপে দাঁড়াল। অনির্বাণ পড়েছিল উলটো হয়ে। তাকেও ধরে ফেলল একজন।

কাকাবাবুর দারুণ আফসোস হল ! শতরঞ্চি টানা একটা পুরনো কায়দা। তাঁর আগেই উচিত ছিল পা দিয়ে শতরঞ্চিটা গুটিয়ে দেওয়া।

ফাগুলাল আর অন্যরা কাকাবাবুদের রিভলভার কেড়ে নিল। তারপর ফাগুলাল বিশ্রী গলায় বলল, "অ্যাই, উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া।"

কাকাবাবুর বাঁ হাঁটুতে জোর গুঁতো লেগেছে। তিনি আস্তে-আস্তে উঠতে লাগলেন।

ফাগুলাল ধমকে বলল, "জলদি ওঠ, জলদি !"

কাকাবাবু বললেন, "একটু সময় দাও, দেখছ না খোঁড়া মানুষ !"

ফাগুলাল বলল, "খোঁড়া মানুষ তো এখানে মরতে এসেছিস কেন ?"

এই বলে ফাগুলাল কাকাবাবুর পেটে একটা লাথি কষাল !

সন্তু শিউরে উঠল। তার হাতে ছুরি আছে বটে, কিন্তু ওদের হাতে রিভলভার। সন্তু কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে বললেন, "আমি তো উঠছিলামই। তবু তুমি আমাকে মারলে কেন ? এর জন্য তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে !"

ফাগুলাল হ্যা-হ্যা করে হাসতে-হাসতে বলল, "ওরে চুনি, ওরে গোপ্‌লা। এই খোঁড়াটা কী বলে রে ! আমাদের নাকি শাস্তি দেবে !"

চুনি নামের লোকটি বলল, "এদের নিয়ে এখন কী করি ? শেষ করে দিই ?"

ফাগুলাল বলল, "এখানে মারলে লাশগুলো নিয়ে ঝঞ্ঝাট হবে ! জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যাই, মেরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিলেই কাম ফতে !"

অনির্বাণ বলল, "ফাগু, তুমি পুলিশের লোক হয়ে খুন করবে ? তোমার ধরা পড়ার ভয় নেই ?"

ফাগুলাল ভেংচিয়ে বলল, "ধরা পড়ার ভয় নেই ! কে ধরবে ? কে জানবে ? এস. পি. সাহেব, তুমি তো জ্যান্ত ফিরছ না !"

চুনি সন্তুর দিকে চেয়ে বলল, "এই ছোঁড়াটা যে ছুরি বাগিয়ে আছে ! এই, ফ্যাল ছুরিটা !"

সন্তু চঞ্চলভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল ।

চুনি বলল, "ওর হাতে গুলি চালাব ?"

কাকাবাবু কঠিন গলায় বললেন, "ওর হাতে যে গুলি করবে, তার হাতখানা আমি ছিঁড়ে শরীর থেকে আলাদা করে দেব !"

ওরা তিনজনই এবার কাকাবাবুর দিকে ফিরে তাকাল । এরকম কথা যেন তারা কখনও শোনেনি ।

ফাগুলাল ভুরু তুলে একটুক্ষণ কাকাবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বলল, "এ-লোকটা তো অদ্ভুত ! পাগল নাকি ? তুই এত বড়-বড় কথা বলছিস কেন রে ? এক্ষুনি যদি তোর কপালটা ফুটো করে দিই, তা হলে তোকে কে বাঁচাবে ?"

কাকাবাবু কটমট করে তাকিয়ে আছেন ঠিক ফাগুলালের চোখের দিকে । তাঁর কপাল ও মুখের চামড়া কুঁচকে গিয়ে ভয়ঙ্কর দেখাল । তিনি বিরাট জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "আমায় মারবি ? মার দেখি তোর কত সাহস ? রাজা রায়চৌধুরীকে যে মারবে সে এখনও জন্মায়নি ।"

ঠিক মশা-মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে কাকাবাবু বিদ্যুদ্বেগে ফাগুলালের রিভলভার-ধরা হাতখানায় একটা চাপড় মারলেন । ফাগুলালও গুলি চালাল, কিন্তু হাতটা সামান্য বেঁকে যাওয়ায় সেই গুলি লাগল দেওয়ালে ।

কাকাবাবু এর পরেই লোহার মতন মুষ্টিতে একটা ঘুসি মারলেন ফাগুলালের চোখে । সে আর্ত চিৎকার করে বসে পড়ল ।

সন্তুও সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে পড়েছে চুনির ঘাড়ে । ছুরিটা তার গলায় ঠেকিয়ে বলল, "রিভলভারটা ফেলে দাও ! নইলে গেলে !"

অন্য লোকটির কাছে কোনও অস্ত্র নেই । সে এইসব ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভয় পেয়ে দৌড় লাগাল সিঁড়ির দিকে ।

কিন্তু এই সাফল্য বেশিক্ষণ ভোগ করা গেল না ।

কাকাবাবু আর সন্তু রিভলভার দুটো কুড়িয়ে নেওয়ার আগেই সিঁড়ির পাশের একটা ঘুলঘুলি থেকে গম্ভীর গলায় কেউ বলল, "বাঃ বাঃ, নাটক বেশ জমে উঠেছিল । কিন্তু আর দরকার নেই । খেলা শেষ । রাজা রায়চৌধুরী, রিভলভারে হাত দেবেন না । এদিকে তাকিয়ে দেখুন, দুটো রিভলভার আপনার দিকে এইম করা আছে । একটু নড়লেই শরীর ঝাঁঝরা হয়ে যাবে । আমি বাজে কথা বলি না ।"

কাকাবাবু দেখলেন, দুটো ঘুলঘুলি থেকে বেরিয়ে আছে দুটো রিভলভারের নল ।

কাকাবাবু সোজা হয়ে দাঁড়ালেন ।

সেই কণ্ঠস্বর আবার বলল, "ছেলেটাকে বলুন, বাঁদরের মতন যেন আর লাফালাফি না করে । তা হলে আপনিই আগে মরবেন ।"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকালেন । সন্তু সরে গেল দেওয়ালের দিকে ।

কণ্ঠস্বরটি আবার বলল, "এই চুনি, এই ফাগু, অপদার্থের দল ! একজন খোঁড়া আর একটা বাচ্চা ছেলের সঙ্গেও লড়তে পারিস না ? অস্তর দুটো কুড়িয়ে নিয়ে তাক করে থাক ।"

তারপর সিঁড়িতে জুতোর মশমশ শব্দ করে নেমে এসে ঘরে ঢুকল একজন লোক। থুতনিতে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে বড় কালো চশমা, মাথায় কাউবয়দের মতন টুপি। পাক্কা সাহেবের মতন পোশাক !

ঘরে ঢুকে বলল, "চুনি, সোনাগুলো বাক্সে ভরে ফেল। আমার ঘোড়ায় তুলে দিবি।"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে হেসে বলল, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী ! আপনার অলৌকিক ক্ষমতা আছে নাকি ? আপনাকে যে মারবে সে এখনও জন্মায়নি। আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে। পর-পর দুটো বুলেট যদি আপনার বুকে ঠুসে দিই, তারপর কী হবে ?"

কাকাবাবু শান্তভাবে বললেন, "চেষ্টা করে দেখুন না !"

লোকটি বলল, "ওই-ফাগুলালের মতন আমাকেও চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাবেন নাকি ? আমার হাত কাঁপে না। তবে বুলেটের বদলে অন্যভাবেও মারা যায়। আপনারা তো একটা গাড়ি এনেছেন দেখলাম। সেই গাড়িতে চাপিয়েই আপনাদের একটা পাহাড়ে নিয়ে যাব। সেখান থেকে গাড়িসুদ্ধু গড়িয়ে ফেলে দেব একটা খাদে। গাড়িটায় আগুনও জ্বালিয়ে দেব। তারপর দেখব, আপনারা কী করে বাঁচেন ! সবাই ভাববে, আপনারা তিনজনেই গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছেন।"

সন্তুর দিকে ফিরে সে বলল, "নো হ্যাংকি-প্যাংকি বিজনেস। আজ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেউ পালাতে পারেনি। যদি তাড়াতাড়ি মরতে না চাও, তা হলে চুপচাপ থাকো।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনি জিভের তলায় একটা গুলি রেখে গলার আওয়াজটা বদলাবার চেষ্টা করছেন। ওটার আর দরকার নেই। আমি ঠিকই চিনতে পেরেছি। থুতনির দাড়িটা যে নকল, তাও জানি। রাত্তিরবেলা কালো চশমা পরবারই বা দরকার কী ?"

লোকটি থুঃ করে একটা কাচের গুলি মুখ থেকে ফেলে দিল বাইরে। কালো চশমাটা খুলতে-খুলতে বলল, "আপনি বুদ্ধিমান লোক তা জানি। কিন্তু কেন আমার খপ্পরে পড়তে এলেন ? এবারেই আপনার লীলাখেলা শেষ !"

অনির্বাণ দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "কর্নেল সমর চৌধুরী ? আপনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "মানুষের লোভের শেষ নেই। মিলিটারিতে এত ভাল চাকরি করেন, তবু স্মাগলারদের দলের নেতা হয়েছেন !"

অনির্বাণ বলল, "আর্মির দু-একজন অফিসার বর্ডারে চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত, এরকম রিপোর্ট পেয়েছি। কিন্তু কর্নেল সমর চৌধুরীর মতন মানুষ··· ভাবতেই পারিনি !"

সমর চৌধুরী বললেন, "চোপ ! আর একটাও কথা নয় ! এই ফাগু, সোনাগুলো চটপট ভরে নে। বেশি দেরি করা যাবে না। তোদের টাকা কাল পেয়ে যাবি। ঠিকঠাক বাড়িতে পৌঁছে যাবে।"

কাকাবাবু তবু বললেন, "এত সোনা, এর তো অনেক দাম।"

সমর চৌধুরী বললেন, "লোভ হচ্ছে নাকি ? আমার দলে যোগ দেবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার দলটাই তো আর থাকবে না। পুলিশ এবার সব জেনে ফেলবে !"

সমর চৌধুরী বললেন, "আপনার মনের জোর আছে তা

স্বীকার করতেই হবে। পুলিশকে কে জানাবে? আর ঠিক আধঘণ্টার মধ্যে আপনারা তিনজনেই খতম। এ নিয়ে বাজি ফেলতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে বাজি রইল!"

সমর চৌধুরী হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, "কার সঙ্গে বাজি লড়ছি আমি? আপনি তো মরেই যাচ্ছেন, রাজা রায়চৌধুরী!"

সোনাগুলো প্রথমে দুটো কাগজের বাক্সে রেখে তারপর দুটো ক্যাম্বিসের থলিতে ভরা হল। সমর চৌধুরী নিজে সে দুটো এক হাতে নিয়ে অন্য হাতে রিভলভারটা ধরে রইলেন।

তারপর সবাই বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

কাকাবাবুর ঠিক পেছনে সমর চৌধুরী। তাঁর ঘাড়ের কাছে রিভলভারটা ঠেকিয়ে বললেন, "যদি আধ ঘণ্টা আগেই মরতে না চান, তা হলে ভাল ছেলের মতন সিঁড়ি দিয়ে উঠুন।"

চাতাল থেকে বাড়ির একেবারে বাইরে আসতেই একটা ঘোড়ার চিঁহিহি ডাক শোনা গেল। জ্যোৎস্নায় দেখা গেল, খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় একটা ঘোড়া লাফালাফি করছে। তার ডাক শুনলে মনে হয়, সে ভয় পেয়েছে কোনও কারণে।

সমর চৌধুরী বললেন, "ঘোড়াটার আবার কী হল?"

ফাগুলাল বলল, "কাছাকাছি বাঘ-টাঘ এসেছে নাকি?"

সমর চৌধুরী বললেন, "ঘোড়াটা বাঁধা আছে। বাঘ এলে কি এতক্ষণ আস্ত রাখত? অন্ধকারে একা থাকতে ওর ভাল লাগছে না। শোন ফাগুলাল, খানিকটা দূরে একটা জিপগাড়ি আছে। এরা এনেছে। এদের সেই জিপে চাপাতে হবে। তুই চালাবি। আমি ঘোড়া নিয়ে পাশে-পাশে যাব। তিনমুণ্ডি পাহাড়ের ওপর থেকে গাড়িসুদ্ধু ওদের ফেলে দিতে হবে। পেট্রোল ট্যাঙ্কে আমি নিজে আগুন জ্বেলে দেব!"

ঘোড়াটা এই সময় দু' পা তুলে দাঁড়িয়ে একটা বীভৎস চিৎকার করল। যেন সে মরতে বসেছে।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা আলো এসে পড়ল সেখানে। টর্চের আলো নয়। অনেক তীব্র। এই আলো আসছে বনবাজিতপুরের টোবি দত্তের বাড়ির ছাদ থেকে।

সেই আলোয় দেখা গেল ঘোড়াটার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা ধবধবে সাদা কঙ্কাল। মাঝে-মাঝে সে এক হাত দিয়ে ঘোড়াটার পেটে মারছে।

সমর চৌধুরী বললেন, "ওটা কী?"

ফাগুলাল কাঁপতে-কাঁপতে বলল, "ভূ-ভূ-ভূ-ভূত! সেই ভূতটা আবার এসেছে! আমাদের তিনজনকে মেরেছে!"

অন্য লোকগুলো ভয়ে চিৎকার করতে-করতে দৌড় লাগাল উলটো দিকে।

সন্তুর বুকের মধ্যে টিপটিপ করছে। এবার তো ওর চোখের ভুল নয়। সবাই দেখছে।

সমর চৌধুরী ভয় পাননি। ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, "ভূত না ছাই! কেউ একটা সঙ সেজে এসেছে।"

পর-পর দু'বার গুলি চালাল সে। সে-গুলি ছিটকে বেরিয়ে গেল, কঙ্কালটার কোনও ক্ষতি হল না।

কঙ্কালটা একটা বাচ্চা ছেলের গলায় বলে উঠল, "আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা!"

তারপর দুলে-দুলে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে।

এবার ফাগুলালও 'বাবা রে' বলে দৌড় লাগাল প্রাণপণে।

কাকাবাবু ঠাট্টার সুরে বললেন, "কী হে কর্নেল চৌধুরী, তুমিও এবার পালাবে না?"

সমর চৌধুরী মুখ ফিরিয়ে চোটপাট করে বললেন, "এটা কী? তোমরা এনেছ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ! আমরা কঙ্কাল-টঙ্কালের কারবার করি না।"

অনির্বাণ জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এটা কি সত্যিই একটা কঙ্কাল?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যা দেখছ, আমিও তাই দেখছি!"

অনির্বাণ বলল, "একটা কঙ্কাল কি সত্যি-সত্যি হাঁটতে পারে? এ কখনও হয়?"

কাকাবাবু বললেন, "না, কঙ্কাল হাঁটতে পারে না। তা হলে এটা কঙ্কাল নয়!"

সমর চৌধুরী কঙ্কালটার ঠিক মাথা লক্ষ্য করে আর-একটা গুলি

চালালেন। এবারও ছিটকে গেল সেই গুলি। কঙ্কালটার দু' চোখের গর্তে জ্বলে উঠল লাল আলো। হঠাৎ জোরে-জোরে এগিয়ে এসে এক হাতে চেপে ধরল সমর চৌধুরীর ঘাড়। সেই অবস্থায় তাকে শূন্যে তুলে ঝাঁকুনি দিতে লাগল।

সমর চৌধুরীর হাত থেকে খসে পড়ল রিভলভার। তিনি বিকট চিৎকার করতে-করতে বলতে লাগলেন, "রায়চৌধুরী, বাঁচাও, বাঁচাও! তুমি যা চাইবে দেব। সব সোনা দিয়ে দেব। বাঁচাও!"

কাকাবাবু বললেন, "সব ব্যাপারটা কেমন বদলে গেল? এখন সমর চৌধুরী আমার কাছে সাহায্য চাইছে। কিন্তু কী করে সাহায্য করব?"

কঙ্কালটা এবার দু' হাত দিয়ে সমর চৌধুরীকে ধরে শূন্যে ঘোরাতে লাগল। যেন এবার একটা প্রচণ্ড আছাড় মেরে ওর হাড়গোড় ভেঙে দেবে!

এই সময় ঘোড়াটার পেছন দিকের অন্ধকার থেকে কেউ ডেকে উঠল। "রোবিন! রোবিন!"

কঙ্কালটা সঙ্গে-সঙ্গে থেমে গেল। শূন্যে তুলে রাখল সমর চৌধুরীকে।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল টোবি দত্ত। তার একটা চোখ, অন্য চোখটার জায়গায় অন্ধকার।

সন্তু এখন যদিও জানে যে, টোবি দত্তর একটা চোখ পাথরের, তবু সেটা এখন নেই, চোখের জায়গায় খোঁদলটা দেখে তার বুকটা কেঁপে উঠল।

টোবি দত্ত জাপানি ভাষায় কিছু একটা আদেশ করতেই কঙ্কালটা সমর চৌধুরীকে আছাড় না মেরে আস্তে করে নামিয়ে দিল মাটিতে।

টোবি দত্ত এবার এক হাত বাড়িয়ে অস্বাভাবিক গলায় চেঁচিয়ে বলল, "আই ফর অ্যান আই ! চোখের বদলে চোখ ! রাজু, তুই আমার একটা চোখ নষ্ট করেছিলি, আজ তোর একটা চোখ আমি খুবলে নেব !"

কাকাবাবু অস্ফুট গলায় বললেন, "সমর চৌধুরীই তা হলে রাজু । ওরা দুই পুরনো শত্রু !"

টোবি দত্ত আবার বলল, "আমার পোষা কঙ্কাল তোর হাড় গুঁড়ো করে দিতে পারত । কিন্তু আমি নিজের হাতে তোকে শাস্তি দেব ! হেলিকপটার নিয়ে গিয়ে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলি ? তোর ওই হেলিকপটার আমি ইচ্ছে করলেই গুলি করে উড়িয়ে দিতে পারতাম । খালি হাতে লড়ার সাহস আছে ? আয় !"

সমর চৌধুরী অনেকটা সামলে নিয়েছেন । একবার পেছন ফিরে তিনি কঙ্কালটাকে দেখলেন । সমর চৌধুরী শক্তিশালী পুরুষ । খালি হাতে লড়াই করলে তিনিই হয়তো জিতবেন ।

কঙ্কালটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । সে কাকাবাবুদের দিকে গ্রাহ্যই করছে না ।

কাকাবাবু বললেন, "এবার বুঝতে পারলে, ওটা একটা রোবট । জাপানে রোবট দিয়ে অনেক কলকারখানায় এখন কাজ করানো হয় । টোবি দত্ত সেখান থেকে রোবট বানানো শিখে এসেছে । তারপর কঙ্কালের মতন সাজিয়েছে ।"

অনির্বাণ বলল, "ও আমাদের কিছু করবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই কম্পিউটারে প্রোগ্রাম করা । ভয়েস অ্যাকটিভেটেড । টোবি দত্ত হুকুম না দিলে কিছুই করবে না ।"

ওদিকে সমর চৌধুরী একটা ঘুসি চালাতে যেতেই টোবি দত্ত ধরে ফেলল তাঁর হাত । এক হ্যাঁচকা টানে তাঁকে ফেলে দিল

উলটে । টোবি দত্ত তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সমর চৌধুরী আবার উঠে দাঁড়ালেন । দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, "ত্যাপা, তোর মতন দু-তিনটেকে আমি ছিঁড়ে ফেলতে পারি ।"

তারপর শুরু হয়ে গেল শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই । একবার টোবি সমরকে মাটিতে ফেলে বুকে চেপে বসে, আবার সমর দু' পায়ের লাথিতে টোবিকে ছিটকে ফেলে দেন । কঙ্কাল-রোবটটা ওঁদের পাশে-পাশে ঘুরছে, যেন সে রেফারি । মারামারিতে বাধা দিচ্ছে না ।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, সোনার থলি দুটোর ওপর তুই নজর রাখ । অনির্বাণ, তুমি সমরের রিভলভারটা তুলে নাও । যদি ওর চ্যালারা ফিরে আসে, তখন কাজে লাগবে । তবে মনে হয় ভূতের ভয়ে ওরা আর ফিরবে না । এই রোবটটাই ওদের তিনজনকে মেরেছে ।"

অনির্বাণ বলল, "এদের লড়াই কতক্ষণ চলবে ? কে জিতবে বোঝা যাচ্ছে না ।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি চাই টোবি জিতুক । সমর চৌধুরী আর্মি অফিসার হয়েও স্মাগলারদের দল চালান । এঁরা দেশের শত্রু । সমাজের ঘৃণ্য জীব । সেই তুলনায় টোবি এমন কিছু অন্যায় করেনি । সে প্রতিশোধ নিতে এসেছে !"

অনির্বাণ বলল, "একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে এরকম খুনোখুনির লড়াই আমার দেখা উচিত নয় । ওদের ছাড়িয়ে দিয়ে অ্যারেস্ট করা দরকার ।"

কাকাবাবু বললেন, "চেষ্টা করে দ্যাখো !"

অনির্বাণ কাছে এগিয়ে যেতেই কঙ্কালটা একটা হাত বাড়িয়ে দিল । সে অন্য কাউকে কাছে যেতে দেবে না ।

হঠাৎ টোবি দত্ত সমর চৌধুরীকে বাগে পেয়ে একটা গাছের

সঙ্গে চেপে ধরে দু'বার মাথা ঠুকে দিল খুব জোরে। সমর চৌধুরী আর সহ্য করতে পারলেন না। ঢলে পড়ে গেলেন মাটিতে।

টোবি দত্ত জয়ের আনন্দে একটা দৈত্যের মতন হুঙ্কার দিয়ে বলল, "এইবার রাজু, আর কোথায় পালাবি? চোখের বদলে চোখ। চোখের বদলে চোখ! আমার চোখ নষ্ট করেছিলি, তোর দুটো চোখই আমি আজ গেলে দেব!"

সে এদিক-ওদিক তাকিয়ে একটা সরু কাঠি খুঁজতে লাগল।

অনির্বাণ উত্তেজিতভাবে বলল, "ও সমর চৌধুরীর চোখ গেলে দেবে। এই দৃশ্য আমরা দেখব?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আর সন্তু ওকে আটকাও। আমি কঙ্কালটাকে সামলাচ্ছি।"

কাকাবাবু কঙ্কালটার কাছে এগিয়ে যেতেই সে হাত বাড়িয়ে বাধা দিল। কাকাবাবুও খপ করে তার হাতখানা চেপে ধরলেন। তারপর শুরু হল পাঞ্জার লড়াই।

কাকাবাবুর হাতে দারুণ শক্তি, কিন্তু একটা রোবটের সঙ্গে পারবেন কেন? কঙ্কালের হাতখানা লোহার, তাতে সাদা রং করা। কাকাবাবু প্রাণপণে লড়তে লাগলেন।

টোবি দত্ত অন্য কিছু না পেয়ে একটা গাছের সরু ডাল ভেঙে নিয়ে অজ্ঞান সমর চৌধুরীর বুকের ওপর চেপে বসল।

কাকাবাবু প্রাণপণে রোবটের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছেন, তাঁর পাশ দিয়ে সন্তু আর অনির্বাণ ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টোবি দত্তর ওপর। টোবি দত্ত দু' হাত চালিয়ে ওদের সরিয়ে দিতে চাইল। সন্তু চেপে ধরল তার গলা, অনির্বাণ রিভলভারের বাঁট দিয়ে খুব জোরে মারল তার মাথায়। তারই মধ্যে টোবি দত্ত গাছের ডালটা ঢুকিয়ে দিয়েছে সমর চৌধুরীর এক চোখে।

কাকাবাবু বললেন, "আমি আর পারছি না! সন্তু, তোরা সরে

যা শিগ্‌গির!"

কঙ্কালটা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিল দূরে। তারপর এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে সন্তু আর অনির্বাণকে দু' হাতে তুলে ছুঁড়ে দিল। টোবি দত্ত অজ্ঞান হয়ে গেছে। কঙ্কালটা তাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর দুলতে-দুলতে হেঁটে-হেঁটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের অন্ধকারে।

অনির্বাণ ধুলো ঝেড়ে উঠে বসে বলল, "টোবি দত্তকে নিয়ে চলে গেল?"

কাকাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই সেরকম প্রোগ্রাম করা ছিল রোবটটাকে। এখন আমরা চেষ্টা করলেও টোবিকে উদ্ধার করতে পারব না। পরে অনেক সময় পাবে। এর পর টোবিকে ধরা কিংবা তাকে শাস্তি দেওয়া পুলিশের কাজ। আমি আর সন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাতে রাজি নই। সমর চৌধুরীর এখনই চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে যে তিনি মারা যাবেন! ওঁকে বাঁচানো দরকার। বাঁচিয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া দরকার।"

সমর চৌধুরীর ঘোড়াটা কোনওক্রমে বাঁধন খুলে পালিয়ে গেছে এর মধ্যে। সমর চৌধুরীকে নিয়ে যেতে হবে খানিকটা দূরে জিপে। তাঁর এখনও পুরো জ্ঞান ফেরেনি। চোখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ছে আর গলা দিয়ে বেরোচ্ছে একটা গোঙানির শব্দ।

সন্তু আর অনির্বাণ সমর চৌধুরীকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। কাকাবাবুকে নিতে হল সোনার থলি দুটো। ফাগুলালের দলবল কঙ্কালের ভয়ে একেবারেই পালিয়েছে।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে কাকাবাবু ওপরের দিকে তাকালেন। আকাশে আজ ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। দমকা হাওয়া উঠছে মাঝে-মাঝে। তাতে জঙ্গলের নানারকম গাছে

নানারকম পাতায় শব্দ হচ্ছে বিভিন্ন রকম।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, "কী সুন্দর আজকের রাতটা! এর মধ্যেও মানুষ মারামারি, খুনোখুনি করে? ছিঃ! এর চেয়ে নদীর ধারে বসে গান গাইলে কত ভাল লাগত!